Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας (মহাপ্রাণ সাধু বাসিল)
Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ)

গ্রীক পাঠ্যের লিংক।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : June 24, 2024

Version 1.1 (April 18, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

মহাপ্রাণ সাধু বাসিল

পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

- সাধু বাসিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী
- ‘পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ’
- শব্দার্থ

পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

গণনা (গণনাপুস্তক)

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রবচন (প্রবচনমালা)

উপ (উপদেশক)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

সিরা (বেন সিরা)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

বিলাপ (বিলাপ-গাথা)

এজে (এজেকিয়েল)

দা (দানিয়েল)

মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রোমী (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)

২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

সাধু বাসিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু বাসিল আনুমানিক ৩৩০ সালে কাপ্পাদোকিয়ায় (আজকালের তুরস্কের মধ্যবর্তী অঞ্চলে) অবস্থিত কায়েসারিয়া (আজকালের কাইসেরি) শহরে আদর্শ-খ্রিষ্টিয়ান একটা ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাসিল নামক তাঁর পিতা ছিলেন সাধ্বী মাক্রিনার সন্তান, ও এমেলিয়া নামক বাসিলের মাতা ছিলেন একজন সাক্ষ্যমরের কন্যা, এবং সাধু বাসিলের দশ ভাইবোনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তাঁর বড় বোন সাধ্বী মাক্রিনা, ও তাঁর ছোট ভাই সাধু গ্রেগরি (অর্থাৎ নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি) ও সাধু পিতর। তিনি নিজের পিতার হাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিভাবান যুবক বাসিল আগে নিজ শহরের, পরে কনস্তান্তিনোপলিসের, ও অবশেষে, ৩৫১ সাল থেকে, এথেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এথেন্সের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি নাজিয়াঞ্জুসের ভাবী বিশপ সাধু গ্রেগরির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করেন যা আজীবন বন্ধুত্ব হয়ে থাকবার কথা। ৩৫৬ সালের দিকে তিনি নিজের জন্মস্থান কায়েসারিয়াতে ফিরে গিয়ে বক্তৃতাবিদ হিসাবে স্বল্পকালীন কর্মজীবন শুরু করেন।

সাধু বাসিল শীঘ্রই তাঁর জাগতিক কর্মজীবন পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত জীবন কামনা করেন। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ হলো বাপ্তিস্ম নেওয়া, এটা এমন সময়ে হয় যখন প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণত মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত বাপ্তিস্ম বিলম্বিত করতেন যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য বাপ্তিস্ম-পরবর্তী খ্রিষ্টিয়ান জীবনের কঠোরতা এড়ানো যায়। তাঁর দ্বিতীয় ধাপ হলো মিশর, পালেস্তিনা (তথা ফিলিস্তিন), সিরিয়া ও মেসোপতামিয়ার বিখ্যাত তপস্বী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পূর্ব ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করা। তপস্বা-জীবনে সেই সন্ন্যাসীদের অটলতা তাঁকে অনুপ্রাণিত ক'রে যথাসাধ্য তাঁদের অনুকরণ করতে তাঁকে প্রেরণা দেয়।

ফিরে আসার পর তিনি, ধনী যুবকের কাছে প্রভু যে উপদেশ দিয়েছিলেন (মথি ১৯:২১ দ্রঃ) তা পালন করে নিজের সমস্ত সম্পত্তি গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দেন; এরপর তিনি ইরিস নদীর ধারে অবস্থিত নেওকায়েসারিয়ার (আজকালের নিক্সার) কাছে নির্জনে চলে যান; কিন্তু বেশি দিন একা থাকেন না, কেননা অনেকে শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় এবং তাঁর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ জীবনে সহভাগী হয়। যখন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেই গ্রেগরি ৩৫৮ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তখন তাঁরা ফিলোকালিয়া নামক অরিগেনেসের রচনাগুলোর একটা সংকলন এবং সেইসাথে ঐক্যবদ্ধ জীবন ভিত্তিক সন্ন্যাস-জীবনের বিস্তারে প্রভাবশালী দু'টো সন্ন্যাস-নিয়ম সংকলন করেন। এই সন্ন্যাস-নিয়ম দু'টো প্রকৃতপক্ষে সাধু বাসিলকে 'গ্রীক সন্ন্যাস-জীবনের বিধানকর্তা' উপাধি অর্জন করে যেহেতু বিজাতীয় সন্ন্যাসজীবনের ভিত্তি স্থাপন করে। এমনকি তাঁর কর্মজীবনের এই প্রাথমিক পর্যায়ে, সাধু বাসিল বেশ কয়েকটা মঠ প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে একজন কর্মক্ষম ব্যক্তিত্ব দেখান।

এই ধরনের কর্মকাণ্ড তত সহজে কারও নজর এড়াতে পারে না: বাস্তবিকপক্ষে সাধু বাসিল কায়েসারিয়ার বিশপ এইসেবিউসের নজর কেড়ে নেন; ইনি ৩৬৪ সালে সাধু বাসিলকে প্রবীণ পদে শ্রেণিভুক্ত করেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যে সাধু বাসিল ব্যবস্থাপক, উপদেষ্টা ও শিক্ষক হিসাবে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। ৩৭০ সালে এউসেবিউসের মৃত্যুর পর সাধু বাসিল কায়েসারিয়ার বিশপ, কাপ্পাদোকিয়া অঞ্চলের প্রধান বিশপ ও পন্তস-ধর্মপ্রদেশের এক্সার্‌খ (তথা উচ্চপদস্থ বিশপ) হিসাবে তাঁর উত্তরসূরী হন। সেবাকর্মে তাঁর দ্রুততা শীঘ্রই তাঁর প্রতি তাঁর পালের ভালবাসা জয় করে; তিনি হাসপাতাল, দরিদ্রদের জন্য ঘর, ভ্রমণকারীদের জন্য ধর্মশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশাসনে তাঁর সক্ষমতা বাদে সাধু বাসিল এমন যুগে যথার্থ ধর্মতত্ত্বের অপরাজেয় সমর্থনকারী হিসাবে পরিচিত, যে যুগে আরিউস-ভ্রান্তমত সরকারী অনুগ্রহ লাভ করেছিল। 'এউনোমিউসের বিপক্ষে' ও 'পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ' নামক পুস্তক দু'টো ঐশত্রিত্ব সংক্রান্ত খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্বোধন করে। তাঁর সাহসের পাশাপাশি তাঁর বিচক্ষণতাও উল্লেখযোগ্য। যখন রোম সাম্রাজ্যের আরিউসপন্থী সম্রাট বালেন্স বাজেয়াপ্ত ও নির্বাসনের হুমকি দিতে প্রদেশপাল মদেস্তুসকে পাঠান, তখন সাধু বাসিল তাঁকে এত দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেন যে বালেন্স ব্যাপারটা বাতিল করে নির্বাসন-বিধি প্রত্যাহার করেন।

সাধু বাসিলের যুগ এমন যখন মণ্ডলী অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল; সেই যুগে তিনি ঐক্য অন্বেষণ করেন ও অবশেষে মঙ্গল সময় দেখতে পান। আরিউসপন্থী সম্রাট বালেন্স

আদ্রিয়ানোপলিস (আজকালের এদির্নে) এর বিপর্যয়মূলক যুদ্ধে মারা যান (৯ই আগষ্ট ৩৭৮) এবং যথার্থ ধর্মতত্ত্ববাদী সম্রাট ১ম থেওদোসিউস তাঁর পদে সম্রাট হন। সাধু বাসিল ১লা জানুয়ারী ৩৭৯ সালে ৪৯ বছর বয়সে মারা যান। ৩৮১ সালে, ২য় কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভার মাধ্যমে সম্রাট ১ম থেওদোসিউস মণ্ডলীতে শৃঙ্খলা ও ঐক্য আনেন। এই মহাসভা সেই 'নিকেয়া-কনস্তান্তিনোপলিস বিশ্বাস-সূত্র' জারি করে যার জন্য সাধু বাসিল ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন: বাস্তবিকি, পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে যেখানে নিকেয়ার বিশ্বাস-সূত্র সংক্ষিপ্ত ভাবে বলত, 'এবং [আমরা] পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি', সেখানে কনস্তান্তিনোপলিসের বিশ্বাস-সূত্র বিস্তারিত ভাবে বলে, 'এবং [আমরা] প্রভু ও জীবনদাতা সেই পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি] যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, যিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সমতুল্য উপাসনা ও গৌরবের পাত্র, যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন।'

অর্থোডক্স মণ্ডলী সাধু বাসিলের পর্ব ১লা জানুয়ারীতে, ও লাতিন মণ্ডলী ২রা জানুয়ারীতে পালন করে।

'পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ'

৩৭৫ সালের কাছাকাছি রচিত "পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ" পুস্তকটা নিকেয়া মহাসভার (৩২৫) ঘোষিত যথার্থ ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মশিক্ষার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সাধু আম্ফিলোকিউসকে উৎসর্গ করা হয়: তিনি ছিলেন ইকোনিয়মের বিশপ ও সাধু বাসিলের অনেক দিনের সহকর্মী। পুস্তকের জন্য তাৎক্ষণিক উপলক্ষ ছিল এই অভিযোগ যে, যে গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ সাধু বাসিল জনসাধারণের উপাসনায় ব্যবহার করছিলেন, সেই 'পবিত্র আত্মা সহ পুত্রের সঙ্গে' সূত্রটা একটা নতুনত্ব। সাধু বাসিলের বিরোধীরা 'পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা' সূত্রটাই পছন্দ করছিল, কেননা তাদের মতে এ সূত্রটা খুবই প্রচলিত ও ঐতিহ্যবাহী সূত্র ছিল ও পবিত্র ত্রিত্বের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য (বা আরও সূক্ষ্মরূপে 'প্রতিটি হিপোস্তাসিসের জন্য') উপযুক্ত গৌরবের বিশিষ্ট স্তর প্রকাশ করছিল ('হিপোস্তাসিস' প্রকৃত শব্দের ব্যাখ্যা নিচে, 'শব্দার্থ' অধ্যায়ে, দেওয়া হয়; কিন্ত আপাতত 'হিপোস্তাসিস' শব্দের চেয়ে প্রচলিত ও বোধগম্য 'ব্যক্তি' শব্দই ব্যবহৃত হোক, যদিও প্রকৃতপক্ষে 'ব্যক্তি' শব্দটা ত্রিত্বতত্ত্বে স্বতন্ত্র একটা শব্দ যা গ্রীক ভাষায় πρόσωπον - প্রসোপোন শব্দ দ্বারা চিহ্নিত)। সেই বিরোধীদের ধারণার বিপরীতে

সাধু বাসিল এটা ঘোষণা করেন যে, মণ্ডলী উভয় সূত্রই জানত ও ব্যবহার করে আসছিল, এবং এক একটা সূত্র নিজ নিজ প্রসঙ্গ ও অর্থের অধিকারী। সাধু বাসিল উভয় সূত্র ও সেগুলোর নিজ নিজ ব্যবহার বিশ্লেষণ করেন এবং সেইসাথে প্রতিটি সূত্রের ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তিও বিশ্লেষণ করেন। যখন তিনি এই দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত ধর্মতাত্ত্বিক ধারণাসমূহ তুলে ধরেন, তখন পুস্তকটা পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের একটা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা হয়ে ওঠে। ছয় বছর পরে (৩৮১), যখন মিলানের বিশপ সাধু আম্ব্রোজ 'পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ' নামক পুস্তক রচনা করেন, তখন তিনি সাধু বাসিলের এ পুস্তক নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে ব্যবহার করেন; এবং এইভাবে সাধু বাসিলের ধারণাসমূহ লাতিন মণ্ডলীগুলোকেও প্রভাবিত করে।

পুস্তকের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট হলো নিকেয়া মহাসভার রক্ষকদের বিরুদ্ধে আরিউসপন্থীদের ভ্রান্তমতের বিভিন্ন ধারার অর্ধ-শতাব্দী সংগ্রাম, যারা নিজেরাও নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ একমত ছিল না। সাধু আথানাসিউসের মত যাঁরা ছিলেন নিকেয়ার পুরানো সমর্থক, তাঁরা নিকেয়া-বিশ্বাস-সূত্রে ব্যবহৃত ὁμοούσιος (হমোউসিওস) অর্থাৎ 'সমসত্তার অধিকারী' শব্দটার পক্ষে অবিচল ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন: এভাবে তাঁরা সত্তায় পিতা ও পুত্রের ঐক্য রক্ষা করছিলেন যেহেতু 'সত্তায়' সেই ঐক্যই ছিল 'সত্তা' শব্দের শক্তি। কিন্তু সাধু বাসিল ও কাপ্পাদোকিয়ার অন্যান্য পিতৃগণের মত যাঁরা ছিলেন নিকেয়ার নবীন সমর্থক, তাঁরা এমন একটা চিন্তাধারা থেকে এসেছিলেন যা ὁμοιούσιος (হমোইউসিওস) অর্থাৎ 'সদৃশ সত্তার অধিকারী' শব্দটা পছন্দ করছিলেন। অবশ্যই, শব্দ হিসাবে, ὁμοιούσιος (হমোইউসিওস) শব্দটার ত্রুটি ছিল, কেননা নতুন শব্দ হওয়ায় তার ব্যবহার নতুনত্ব বলে গণ্য হতে পারত। যাঁরা ὁμοιούσιος (হমোইউসিওস) শব্দের পক্ষপাতী, তাঁরা ভয় করছিলেন, ὁμοούσιος (হমোউসিওস) শব্দটা সত্তার ঐক্যের চেয়ে আরও বেশি কিছু বোঝাতে পারে, এমনকি পবিত্র ত্রিত্বের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্রয়ের বিভ্রান্তিও বোঝাতে পারে, অর্থাৎ শব্দটা সাবেল্লিউসের ভ্রান্তমতও সমর্থন করতে পারে। অন্যদিকে, ὁμοιούσιος (হমোইউসিওস) ঐতিহ্য ব্যক্তি হিসাবে পিতা ও পুত্রের স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেওয়ার সুবিধার অধিকারী ছিল। অবশেষে সাধু আথানাসিউস ও কাপ্পাদোকীয় পিতৃগণ নিকেয়া মহাসভার প্রতিরক্ষায় একে অপরকে মিত্র বলে গণ্য করেন। যদিও তাঁদের ঐতিহ্য পরিভাষায় কিছুটা ভিন্ন ছিল, তাদের ধর্মতাত্ত্বিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য ছিল একই। কিন্তু তবুও ὁμοιούσιος (হমোইউসিওস) শব্দের পক্ষপাতীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন

যাঁরা সত্তার ঐশ্বরিক ঐক্যের উপর এত কম জোর দিতেন যে, সেই ঐক্য প্রায়ই ঘোষিত ছিল না। এনারা 'অর্ধ-আরিউসপন্থী' বলে অভিহিত ছিলেন। নিকেয়ার পুরানো সমর্থকগণ থেকে আরও দূরে তারাই ছিল যারা পুত্রকে সৃষ্টজীব বলে মানত: তারা ছিল গোড়া আরিউসপন্থী। তথাপি ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে এই দলটা ক্রমশ খুবই ছোট সংখ্যালঘু দল হয়ে পড়ছিল।

তাই মূল সংগ্রাম এটা ছিল, যাঁরা ছিলেন ὁμοιούσιος (হমোইউসিওস) শব্দের পক্ষপাতী, তাঁদের ὁμοούσιος (হমোউসিওস) শব্দের সমর্থক করে তোলা। তাঁরা কি আরিউসের ভ্রান্তমতে যোগ দেবেন, নাকি নিকেয়া মহাসভা গ্রহণ করবেন? 'ঐশতত্ত্ববিদ' বলে পরিচিত নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরি ও সাধু বাসিলের ভাই নিসার বিশপ গ্রেগরির সঙ্গে, সাধু বাসিল ὁμοιούσιος (হমোইউসিওস) শব্দের অর্থ পরিমার্জিত করেন যাতে শব্দটা ব্যক্তি হিসাবে পিতা ও পুত্রের বিশিষ্টতা আরও উপযুক্তভাবে নির্দেশ করে। এক কথায়, তাঁরা ঐশ্বরিক স্বরূপের পাশাপাশি, ব্যক্তি হিসাবে পিতা ও পুত্রের বিশিষ্টতাও রক্ষা ক'রে ὁμοούσιος (হমোউসিওস) সংক্রান্ত পরম্পরাগত শিক্ষাকে ὁμοιούσιος (হমোইউসিওস) সংক্রান্ত পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে সংজ্ঞায়িত করেন। সাধু বাসিল ও কাপ্পাদোকীয় পিতৃগণের মহৎ অবদান হলো নিকেয়া মহাসভার পক্ষে ὁμοιούσιος (হমোইউসিওস) শব্দের পক্ষপাতীদের জয় করা।

তবে 'পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ' পুস্তকটা এসব কিছুর মধ্যে কোথায় স্থান পায়? উপরোল্লিখিত বিতর্কগুলোতে, সমস্যাটা ছিল পিতা ও পুত্রের সমসত্তা সংক্রান্ত। ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে নিকেয়া মহাসভার সমর্থকেরা প্রায় জয়ী হয়েছিলেন। অবশ্যই, সম্রাট বালেন্স তখনও আরিউস-ভ্রান্তমত সমর্থন করছিলেন, কিন্তু আদ্রিয়ানোপলিসে তাঁর মৃত্যু (৯ই আগষ্ট ৩৭৮) এবং রাজপদে ১ম থেওদোসিউসের আগমনের ফলে (৩৭৯) রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে নিকেয়া-ভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ বিজয়ের দিকে আরও বেশি এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তবুও এসব কিছুতে পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের সম্পর্ক কী? তাঁর ঈশ্বরত্ব-সমস্যা আগের বিতর্কগুলোতে সামান্যই ছিল। সেই কাল পর্যন্ত, 'সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও' (মথি ২৮:১৯) উক্তির উপর ভিত্তিক এই ত্রিত্ববাদী সূত্র ব্যবহার করেই খ্রিষ্টিয়ানদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়ে আসছিল বটে, কিন্তু পবিত্র আত্মা কি মাত্রায় ঐশ্বরিক ছিলেন তা তখনও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করা হয়নি।

সাধু বাসিলের বিরোধীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন যাঁরা পুত্রের ঈশ্বরত্বকে ঘোষণা করছিলেন বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু আসলে পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। আরও মনে হচ্ছিল, অন্যান্য কেউ, হয় তো, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে ঈশ্বরত্বের বিভিন্ন মাত্রা দেখতে পাচ্ছিলেন। আরিউসপন্থীদের মধ্যে সম্ভবত এরাই ছিলেন আরও উগ্র বিরোধী দল। এটাই সম্ভব হতে পারে যে, পবিত্র আত্মার পূর্ণ ঈশ্বরত্বের বিরোধীরা নিজেদের মতামতে ততটাই বৈচিত্র্যময় ছিল যতটা বৈচিত্র্যময় তারাই হয়েছিল যারা পুত্রের পূর্ণ ঈশ্বরত্বের বিরোধিতা করেছিল। যাই হোক না কেন, এই 'প্নেউমাতোমাখীয়' তথা পবিত্র আত্মার এই বিরোধী যোদ্ধারা পবিত্র আত্মার পূর্ণ ঈশ্বরত্বকে ঘোষণা করত না।

সাধু বাসিল বিভিন্ন ভাবে এই 'প্নেউমাতোমাখীয়দের' উত্তর দেন। পবিত্র শাস্ত্রের অধিকারের উপর নির্ভর করে তিনি দেখান, পবিত্র আত্মাকে 'প্রভু' বলা হয়েছিল এবং এর ফলে তিনি পিতা ও পুত্রের চেয়ে নিম্ন পদের অধিকারী নন। মানুষের আলোকীকরণ, পবিত্রীকরণ ও পরিত্রাণে, এবং সেইসাথে সৃষ্টিতেও পবিত্র আত্মার কাজগুলোর মহত্ত্ব ও গৌরব থেকে তিনি পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বকে প্রমাণ করেন, কেননা যে কাজগুলো শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি যথাযথভাবে আরোপিত, সেই কাজগুলো কেবল ঈশ্বরই সাধন করতে পারেন। যেহেতু এগুলো ছিল পবিত্র আত্মার কাজ, সেজন্য পবিত্র আত্মাকে অবশ্যই ঈশ্বর হতে হবে। সাধু বাসিল পবিত্র ত্রিত্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্রয়কে ঘোষণা করেন, অর্থাৎ, তিনি পিতাকে অজনিত বলে, পুত্রকে পিতার জনিতজন বলে, ও পবিত্র আত্মাকে পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন বলে ঘোষণা করেন; তবু তিনজনই ঐশ্বরিক স্বরূপে সমানভাবে অংশীদার এবং এর ফলে তিনজনই সমানভাবে ঐশ্বরিক। সাধু বাসিল যুক্তি দেন যে, পবিত্র ত্রিত্বের তিনটি সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক ব্যক্তিকে ঘোষণা করাটা হলো সেই বহু-ঈশ্বরবাদ এড়ানোর সর্বোত্তম উপায় যা তিনি তাঁর বিরোধীদের অধীনতাবাদের যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে গণ্য করেন, যেহেতু তিনটি ভিন্ন ঐশ্বরিক সত্তা তিনটি ঈশ্বরকে বোঝাতে পারে।

'পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ' পুস্তকে যা পাওয়া যায় না, তা হলো এমন স্পষ্ট ঘোষণা যে পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর। পরবর্তীকালে, যখন নিকেয়া মহাসভার যথার্থ ধর্মতত্ত্ব প্রাধান্য পায়, তখন কেউ কেউ সাধু বাসিলের আপতদৃষ্টিতে অস্পষ্টতাকে নিন্দাজনক বলে মনে করে। তবু সাধু বাসিল নিজের ঘোষণার সত্যতা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করছিলেন। নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরি বলেন, সাধু বাসিল ব্যক্তিগত ভাবে ও প্রকাশ্য

উপদেশেও এই সত্যটা বেশ স্বচ্ছন্দেই ঘোষণা করতেন। সাধু বাসিল এই পুস্তকে এই সঠিক শব্দগুচ্ছ তথা ‘পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর’ উক্তিটা ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক ছিলেন, কেননা শব্দগুচ্ছটা পবিত্র শাস্ত্রে ও মণ্ডলীর লিখিত পরম্পরাগত শিক্ষায়ও উল্লিখিত নয়। সম্রাট বালেন্স তখনও আরিউসপন্থীদের সমর্থন করছিলেন; তাই যদি সাধু বাসিল তাদের সুযোগ দিতেন, তবে তাঁর শত্রুরা তাঁকে নতুনত্ব দায়ে অভিযুক্ত করত ও তাঁর জবানবন্দি দাবি করত, এবং এর ফলে তাঁর সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাহত করত। সাধু বাসিল বরং অন্য শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে এই শব্দগুচ্ছ সত্য বলে ব্যক্ত করলেন। তেমনটা করে তিনি জানতেন, তিনি যুক্তি প্রয়োগে এবং ফলত সম্পূর্ণরূপেই তাদের পরাজিত করবেন। তাই তিনি ‘পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ’ পুস্তকে ‘পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর’ বাক্যটা এড়ালেন, কিন্তু এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিরোধীদের মন ও তাদের স্বীকৃতি জয় করলেন; এর ফলে তাঁর লেখা কৃতকার্য হলো এবং পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত ধর্মতত্ত্বের জন্য এখনও অপরিহার্য লেখা বলে পরিগণিত।

মণ্ডলীর যথার্থ ধর্মতত্ত্বের প্রতিরক্ষায় তাঁর অক্লান্তিকর প্রচেষ্টার জন্য তিনি ‘দ্বিতীয় আথানাসিউস’ উপাধি অর্জন করেন।

শব্দার্থ

• **‘ব্যবস্থা’, ‘পরম্পরাগত শিক্ষা’ ও ‘থেওলোগিয়া’:** সাধু পল এমন **রহস্য-ব্যবস্থার** কথা উল্লেখ করেন যা আদি থেকে স্রষ্টা ঈশ্বরে গুপ্ত ছিল ও যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে কল্পনা করেছিলেন (এফে ৩:৯ দ্রঃ)। **‘ব্যবস্থা’** শব্দটা (গ্রীক ভাষায় οἰκονομία ওইকোনমিয়া) খ্রিষ্টের মুক্তিদায়ী মাংসধারণ-রহস্যকে নির্দেশ করে। সুতরাং, সেই **‘ব্যবস্থাই’** হলো খ্রিষ্টবিশ্বসীদের সেই মূখ্য বিষয় যা তাদের জীবন ও প্রচারকর্ম চিহ্নিত করে; ঈশ্বরের তেমন রহস্য-ব্যবস্থা না থাকলে বাকি সবকিছু তথা জীবন ও প্রচারকর্মও আর থাকে না।

সাধু পল এমন **‘পরম্পরাগত শিক্ষাও’** (গ্রীক ভাষায় παραδόσεις, পারাদোসেইস) উল্লেখ করেন (১ করি ১১:২) যা মন্ডলীতে সম্প্রদান করা হয় যাতে বিশ্বাসীগণ খ্রিষ্টবিশ্বাসের বিষয়াদি যথার্থ ভাবে শিখতে পারে ও খ্রিষ্টীয় নীতি অনুসারে চলতে পারে। বলা বাহুল্য, পরম্পরাগত শিক্ষার মূল উৎস হলো উপরোল্লিখিত ‘রহস্য-ব্যবস্থা’।

গ্রীক ঐতিহ্যে, প্ল্যাটোর সময় থেকে, অর্থাৎ খ্রিঃপূঃ ৩৮০ সাল থেকে, **‘থেওলোগিয়া’** শব্দ (গ্রীক ভাষায় θεολογία, থেওলোগিযা) প্রচলিত ছিল যার অর্থ, ঈশ্বর বিষয়ে কথা বলা। কিন্তু ৪র্থ শতাব্দীর গ্রীক পিতৃগণের ভাষায় **‘থেওলোগিয়া’** শব্দটা সবসময় ‘ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব’ অর্থ বহন করে, যদিও মাঝে মাঝে শব্দের অর্থ হলো ‘ঐশত্রিত্ব-রহস্য’ বা ‘খ্রিষ্ট-রহস্য’ সংক্রান্ত তত্ত্ব’।

সেই অনুসারে, সাধু বাসিলের এ পুস্তকে **‘ব্যবস্থা’**, **‘পরম্পরাগত শিক্ষা’** ও **‘থেওলোগিয়া’** শব্দত্রয় বারে বারে উল্লিখিত, এবং এক্ষেত্রে তিনি নিজের ‘এউনোমিউসের বিপক্ষে’ পুস্তকে এটা বলেন যে, **‘ব্যবস্থা’** (অর্থাৎ খ্রিষ্টের মাংস হওয়া, বা মাংসধারণ) ও **‘থেওলোগিয়া’** (অর্থাৎ **পরম্পরা** ভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব), দু’টোই স্বীকার করা প্রয়োজন।

- **‘উসিয়া’** (গ্রীক ভাষায় οὐσία, উসিয়া) ও **‘হিপোস্তাসিস’** (গ্রীক ভাষায় ὑπόστασις, হিপোস্তাসিস): সাধু বাসিলের আগে, খ্রিষ্টমণ্ডলীতে ‘উসিয়া’ ও ‘হিপোস্তাসিস’ শব্দ দু’টো একই অর্থ বহন করত তথা ‘সত্তা’। তাতে এবিষয়ে অস্পষ্টতা দাঁড়াচ্ছিল, যেইভাবে উপরের অধ্যায়ে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে; অর্থাৎ সেই অস্পষ্টতার ফলে ভ্রান্তিময় দু’টো বিপদ উপস্থিত হতে পারে: (১) ‘এক-সত্তা’ অর্থাৎ ‘এক-ঈশ্বরত্ব’ এর উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়ার ফলে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার বিশিষ্টতা এক-ঈশ্বরে একীভূত হয়ে বালীন হয়; (২) পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার স্বাতন্ত্র্যের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়ার ফলে এক-ঈশ্বর বিলীন হয়ে তিনটি ঈশ্বরে পরিণত হন। সেজন্য সাধু বাসিল ‘উসিয়া’ ও ‘হিপোস্তাসিস’ শব্দদ্বয়ের জন্য আলাদা এমন অর্থ স্থির করেন যা অনুসারে ত্রিত্ব হিসাবে ঈশ্বর এক-উসিয়া (অর্থাৎ এক-সত্তা) যিনি তিনটে হিপোস্তাসিসে অর্থাৎ তিন প্রকার **অস্তিত্বশীলতা** অনুসারে **অস্তিত্বশীল**। তাতে ত্রিত্ব হিসাবে এক-ঈশ্বর যিনি, তিনি সর্বদাই পিতা-হিপোস্তাসিস, পুত্র-হিপোস্তাসিস, ও পবিত্র আত্মা-হিপোস্তাসিসে অস্তিত্বশীল। ‘হিপোস্তাসিস’ শব্দটা ত্রিত্বতত্ত্বে এখনও ব্যবহৃত যেমন, যিশু খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যকার সংযোগ ‘καθ’ ὑπόστασιν’ (কাথ্ হিপোস্তাসিন) অর্থাৎ ‘হিপোস্তাসিস অনুযায়ী’ সংযোগ বলে অভিহিত। যাই হোক, উপরের অধ্যায়েও যেমন বলা হয়েছে, পবিত্র আত্মা ও ত্রিত্ব বিষয়ক ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে সাধু বাসিলের অবদান অনস্বীকার্য এবং তাঁর শিক্ষা এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ পাছে ভুল শব্দ ব্যবহার

করার ফলে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা এক-ঈশ্বরত্বে একীভূত হন, বা ত্রিত্ব তিন ঈশ্বর হয়ে দাঁড়ান।

- **“সহঅনুক্রম”** ও **“সহঅনুক্রমিত”**, **“সহগণনা”** ও **“সহগণিত”**, এবং **“উপগণনা”** ও **“উপগণিত”**: সুধী পাঠক / পাঠিকা যেন এ অসাধারণ শব্দগুলোর সামনে হতাশ বোধ না করেন। সাধু বাসিল নিজেই স্বীকার করেন, যারা সেই শব্দগুলো ব্যবহার করত তাদের প্রকৃত ধারণা যে কী তা বোঝা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা বড় বড় শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে শুধু এটাই বলতে চাচ্ছিল, পিতা ঈশ্বরের তুলনায় পবিত্র আত্মা, এমনকি পুত্রও, কম মাত্রায়ই ঈশ্বরত্বের অধিকারী।

ইকোনিয়মের পবিত্রজনদের জন্য
বিশপ আম্ফিলোকিউসের সমীপে
কাপ্পাদোকিয়ার কায়েসারিয়ার
পবিত্রজনদের জন্য আর্চবিশপ
আমাদের পিতা বাসিল-লিখিত

পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০

১ম অধ্যায়। **ভূমিকা : থেওলোগিয়ার [ক] ক্ষুদ্রতম অংশও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।**

১। হে ভ্রাতা আম্ফিলোকিউস, আমার কাছে সবচেয়ে সম্মাননীয় হে মাথা, আমি তোমার চরিত্রের স্বীয় বৈশিষ্ট্য তথা তোমার জানার আগ্রহ ও অনুসন্ধানের অক্লান্তিকর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করি; এবং তুমি যে এমনটা মনে কর, ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ব্যবহৃত কথাগুলোর মধ্যে যে একটামাত্র কথাও অপরীক্ষিত ফেলে রাখা উচিত নয়, তোমার এ ধারণার দৃঢ়তা ও সংযমের জন্য আমি ঐকান্তিক ভাবে আনন্দিত। *যে যাচনা করে সে পায়, ও যে খোঁজে সে খুঁজে পায়* [খ] প্রভুর এ উপদেশে তুমি উত্তমরূপে কান দিয়েছ, এবং তোমার জিজ্ঞাসার যথার্থতা লক্ষ করে আমি মনে করি, তুমি সবচেয়ে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও এ প্রচেষ্টায় যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করতে। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে আমি যা আরও বেশি প্রশংসা করি তা এটা যে, আমাকে যাচাই করার লক্ষ্যে বেশির ভাগ মানুষ প্রতিদিন যেভাবে করে থাকে, তুমি সেভাবে নয়,

কিন্তু কেবলমাত্র সত্যকে খুঁজে বের করার লক্ষ্যেই তোমার সমস্ত জিজ্ঞাসা উপস্থাপন কর। আজ তো বহু মানুষ আছে যারা গুপ্তচরের মনোভাবে কান পেতে শোনে ও অবিরত জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু জ্ঞানপ্রিয় প্রাণকে, এমনকি অজ্ঞতা থেকে প্রতিকার হিসাবে সত্যকে অনুসন্ধান করে যে প্রাণ, তা খুঁজে পাওয়া সত্যি কঠিন। অনেকের জিজ্ঞাসা শিকারীর জালের মত ও যোদ্ধাদের ফাঁদের মত আগে থেকে নৈপুণ্যের সঙ্গে পাতা চালাকি লুকোয়। এরা উপকারার্থে নয় কিন্তু এলক্ষ্যেই সমস্যা উপস্থাপন করে যাতে, নিজেদের রুচিমত উত্তর না পেলে এমনটা মনে করতে পারে যে, ঠিক এই না পাওয়াতেই যুদ্ধ করার যথার্থ অজুহাত তাদের রয়েছে।

২। যখন *প্রজ্ঞাকে যাচনা করায় মূর্খ প্রজ্ঞার অধিকারী বলে পরিগণিত* (ক), তখন আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে আর কতই না অধিক মূল্যে সেই সুবিবেচক শিষ্যকে গণ্য করব যে শিষ্য নবীর দ্বারা *সেই আশ্চর্য সুমন্ত্রণাদাতার* (খ) পাশে পাশে উল্লিখিত? যে শিষ্য সিদ্ধতায় পৌঁছবার জন্য সচেষ্ট, তার সমস্ত প্রচেষ্টায় তাকে সহায়তা করায় ও তার উৎসাহে যোগ দেওয়ায় তাকে সমস্ত প্রশংসার যোগ্য গণ্য করা ও অগ্রসর হবার জন্য তাকে উৎসাহিত করা ন্যায়সঙ্গত। থেওলোগিয়ার (গ) ভাষা হালকা ভাবে না শোনা বরং প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি পদাংশের গুপ্ত অর্থ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট থাকা ধর্মভক্তি ক্ষেত্রে অলস লোকদের মানায় না কিন্তু তাদেরই মানায় যারা আমাদের আহ্বানের লক্ষ্য উপলব্ধি করে, তথা মানব স্বরূপের পক্ষে যতখানি সম্ভব ততখানি ঈশ্বরের সদৃশ হওয়া। কিন্তু জ্ঞান ছাড়া কোন সাদৃশ্য হয় না, এবং জ্ঞান শিক্ষার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার সূত্রপাত হলো বচন; কিন্তু পদাংশ ও শব্দই হলো আলোচনার অংশ; ফলত পদাংশ-বিশ্লেষণটা লক্ষ্যহীন কাজ নয় (ঘ)। আপত দৃষ্টিতে এসমস্ত কিছু গৌণ ব্যাপার, কিন্তু এজন্য যে তা উপেক্ষার যোগ্য তা নয়; এমনকি, যেহেতু সত্যকে শিকার করা কঠিন, ঠিক এ কারণেই সব দিক দিয়ে তার পদচিহ্ন খোঁজ করা আবশ্যক। কেননা শিল্পকলায় অভিজ্ঞতা অর্জন যেমন, তেমনি ধর্মভক্তি অর্জনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ দ্বারা বৃদ্ধি পায়; শিক্ষার্থীদের (ঙ) পক্ষে কোন কিছুই উপেক্ষা করা চলবে না। একইপ্রকারে, যে কেউ বর্ণমালার প্রথম অক্ষরগুলো অবহেলা করে সে প্রজ্ঞার সিদ্ধি কখনও পাবে না। ‘হ্যাঁ’ ও ‘না’ দু’টো পদাংশ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ সেই সত্য ও শঠতার চরম সীমা সেই মিথ্যা প্রায়ই

এ দু'টো ক্ষুদ্র শব্দে নিহিত। তবে আমি এসমস্ত বলছি কেন? ইতিমধ্যে খ্রিষ্টের সাক্ষ্যমরদের কয়েকজন কেবল মাথা দিয়েই ইশারা করে সম্মতি জানানোর ফলে ধর্মভক্তির দাবি সম্পূর্ণরূপে শোধ করেছে বলে গণ্য হলেন। ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবে থেওলোগিয়া (চ) সংশ্লিষ্ট কোন্ বচন এতখানিই সংক্ষিপ্ত যা 'পক্ষে' বা 'বিপক্ষে' নির্ধারণ করার জন্য ভারী নয়? যখন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না (ছ), তখন ক্ষুদ্রতম বচনগুলোও উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে কেমন নিরাপদ হতে পারবে? তবে, এই যে শব্দগুলো ক্ষেত্রে তুমি আমাদের কাছে আলো যাচনা করেছে, সেই শব্দগুলো একাধারে সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ: উচ্চারণের সংক্ষিপ্ততা ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র হওয়ায় সেগুলো বিশেষ গুরুত্বেরও অধিকারী নয়; কিন্তু অর্থের শক্তি ক্ষেত্রে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঠিক সেই সর্ষে-দানার মত যা মাটির সকল বীজের চেয়ে ছোট হলেও তবু উপযুক্ত যত্নের পাত্র হলে তার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রয়োগ ক'রে যথেষ্ট উচ্চতা অর্জন করতে সক্ষম। এবং আমরা সামসঙ্গীতের ভাষা ব্যবহার করলে (জ) কেউ যদি পদাংশ ক্ষেত্রে আমাদের 'চতুরতা' দেখে মুচকি হাসে, তাহলে সে জেনে নিক, সে নিজের হাসির অকেজো ফল সংগ্রহ করবে। কিন্তু আমাদের দিক দিয়ে আমরা মানুষদের সমালোচনায় অবনত না হয়ে ও তাদের বিদ্রূপের জন্য ভগ্ন না হয়ে আমাদের অনুসন্ধান চালানোতে ক্ষান্ত হব না। আমি এ শব্দাংশগুলোর ক্ষুদ্রতা বিষয়ে লজ্জাবোধ করা থেকে এত দূরে রয়েছি যে, যদিও সেগুলোর অর্থ ন্যূনতম ভাবেও অনুভব করতে পারতাম তথাপি নিজের বিষয়ে খুশিই হতাম কেমন যেন মহৎ যোগ্যতার পাত্র হতাম, এবং যে ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে এ অনুসন্ধান করে চলে, তাকে আমি বলতাম, সেও ক্ষুদ্র উপকারের পাত্র হয়নি।

৩। সুতরাং, যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি, অধিক মহৎ একটা বিতর্ক ক্ষুদ্র শব্দগুলোতে (ক) কেন্দ্র করে, সেজন্য পুরস্কারের প্রত্যাশায় আমি শ্রম অস্বীকার করি না, কেননা আমি এতে নিশ্চিত যে, সেবিষয় আলোচনা করা আমার পক্ষে ফলপ্রদ হবে ও শ্রোতাদের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী উপকার হয়ে দাঁড়াবে। তাই, যদিও তা বলা দরকার হয় না, তবু ঠিক সেই পবিত্র আত্মারই সহায়তায় আমি এখন ব্যাখ্যায় আসব। এবং যদি তুমি ইচ্ছা কর আমি আলোচনায় পদার্পণ করব, তাহলে আমি একটু পিছনে তথা সমস্যার উৎপত্তির দিকে ফিরে তাকাব। কেননা সম্প্রতিকালে আমি জনগণের সঙ্গে প্রার্থনা করতে

করতে পিতা ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ আলাদা দু'টো সূত্র প্রয়োগে শেষ করতাম; মাঝে মাঝে বলতাম, 'পবিত্র আত্মা সহ পুত্রের সঙ্গে', মাঝে মাঝে বলতাম, 'পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা'। উপস্থিত যারা, তাদের মধ্যে কয়েকজন তা লক্ষ করে আমাদের বিষয়ে এমন অভিযোগ তুলল যে, আমরা অপ্রচলিত সূত্র এমনকি পরস্পর বিরোধীই সূত্র ব্যবহার করছিলাম। কিন্তু তুমি তোমার নিজের উপকারার্থে, অথবা তারা নিরাময়ের অতীত হলে তবে যারা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের রক্ষার্থে এ সূত্র দু'টোর গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট শিক্ষা উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেছ। এবং যেহেতু সেই বিতর্কের উৎপত্তি ক্ষেত্রে আমরা একমত, সেজন্য এখন থেকে আমাদের অগ্রগতি দ্রুত হবে।

২য় অধ্যায়। **পদাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্তমতপন্থীদের আগ্রহের উৎপত্তি।**

৪। পদাংশ ও শব্দগুলো ক্ষেত্রে এ লোকদের মনের সঙ্কীর্ণতা যেভাবে নগণ্য মনে হতে পারে সেই অনুসারে তা নয়, ক্ষুদ্র ধরনের ক্ষতিও ঘটায় না, বরং ধর্মভক্তির বিরুদ্ধে গভীর ও আবৃত একটা স্বীয় উদ্দেশ্য পালন করে। কেননা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত বচনগুলোতে নিহিত ভিন্নতা রক্ষা করার জন্য তারা এমন একগুঁয়ে মনোভাব দেখায় যাতে এর ফলে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার স্বরূপেরও ভিন্নতা সহজে প্রমাণ করতে পারে। তারা এ ভ্রান্তমতের প্রবর্তক সেই এতিউসের কল্পিত অতীতকালীন ফাঁকি যুক্তির উপর নির্ভর করে যে নিজের পত্রগুলোর কোন না কোন স্থানে লিখেছিল, 'যে যে জীব স্বরূপে অসদৃশ, সেগুলো বিষয়ে অসদৃশ ভাবে কথা বলা হয়', এবং এর বিপরীতে লিখেছিল, 'যে যে জীব বিষয়ে অসদৃশ ভাবে কথা বলা হয়, সেগুলো স্বরূপে অসদৃশ'। এবং তার এ সিদ্ধান্তের সপ্রমাণ হিসাবে সে প্রেরিতদূতকে টেনে নিচ্ছিল যিনি বলেছিলেন *মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়; এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়* (ক)। এইভাবে, সেই এতিউসের মতে, শব্দগুলো এক একটার মধ্যে যে সম্পর্কে রয়েছে, শব্দগুলোর নির্দেশিত স্বরূপগুলোও সেই একই সম্পর্কে দাঁড়াবে। তাই যেহেতু "যাঁর থেকে" ও "যাঁর দ্বারা" সূত্র দু'টো ভিন্ন, সেজন্য [সেই এতিউসের মতে] পুত্রকেও পিতা থেকে ভিন্ন হতে হবে।

উল্লিখিত সূত্র দু'টো ক্ষেত্রে সেই লোকদের চিক্কণ চতুরতা তেমন ক্ষিপ্ততা থেকেই আগত। এ ভিত্তিতে তারা পিতা ঈশ্বরকে সংরক্ষিত বিশেষ অধিকার হিসাবে "যাঁর থেকে" সূত্রটা আরোপ করে, পুত্র ঈশ্বরকে "যাঁর দ্বারা" সূত্রটা, ও পবিত্র আত্মাকে "যাঁর মধ্যে" সূত্রটা আরোপ করে। তাছাড়া তারা এটাও ঘোষণা করে যে, এ সূত্রগুলো ব্যবহার কখনও বদলাতে নেই, যাতে—যেইভাবে আমি ইতিমধ্যে বলেছি—উক্তির পার্থক্যের সঙ্গে স্বরূপের পার্থক্যও প্রকাশ পায়। তথাপি এটা আদৌ অস্পষ্ট নয় যে সূত্রগুলো ক্ষেত্রে তাদের ফাঁকি যুক্তি প্রয়োগে তারা ভ্রান্তমতকে একেবারে তেজময় করে রাখতে অভিপ্রায় করে। অতএব এরা চায়, "যাঁর থেকে" সূত্রটা নির্মাতাকে নির্দেশ করবে, "যাঁর দ্বারা" সূত্রটা সাহায্য বা মাধ্যম নির্দেশ করবে, "যাঁর মধ্যে" সূত্রটা কাল বা স্থান নির্দেশ করবে যাতে বিশ্বনির্মাতা (খ) সম্পর্কে এমনটা ভাবা না হয় যে তিনি সাধারণ মাধ্যমের চেয়ে অধিক সম্মানের যোগ্য, এবং অন্যদিকে যাতে এমনটাও স্পষ্ট হয় যে, স্থান ও কাল সংক্রান্ত অবদান ছাড়া পবিত্র আত্মা জীবদের অন্য কিছুই প্রদান করেন না।

৩য় অধ্যায়। সূত্রগুলো ব্যবহার বিষয়ে বাহ্যিক নিয়মাবলি পৌত্তলিক কৃষ্টি থেকে উদ্গত।

৫। তেমন ভ্রান্তিতে বহিরাগত কৃষ্টির এমন লোকদের পর্যবেক্ষণ তাদের চালিত করল যারা "যার থেকে" ও "যার দ্বারা" সূত্র দু'টো স্বরূপে ভিন্ন বিষয়ের উপর আরোপ করেছে। এরা এমনটা মনে করে, "যার থেকে" সূত্রটা জড় পদার্থকে নির্দেশ করে ও "যার দ্বারা" সূত্রটা মাধ্যমকে বা, সাধারণ অর্থে, সাহায্যকে বোঝায়। আর শুধু তা নয়: কেননা সেই দার্শনিকদের গোটা তত্ত্ব একীভূত করার পর বাধা দেওয়ার মত আর কীবা থেকে যাবে যাতে স্বল্প কথায় সত্যের সঙ্গে তাদের অসংলগ্নতাকে ও সেই চিন্তাবিদদের সঙ্গে সেই একই লোকদেরই অমতকে সমালোচনা করা যায়? অসার তত্ত্ববিদ্যার অনুসারী যারা তারা কারণের স্বরূপ ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে ও সেটার বিশেষ বিশেষ অর্থ নির্ণয় ক'রে উৎপত্তিকর কারণসমূহের কথা, সহসাহক কারণসমূহের কথা, বা সহকারণসমূহ ও সিদ্ধতা দানকারী কারণসমূহের কথা প্রচার করে। সে কারণগুলোর জন্য তারা এমন নানা সংজ্ঞাও নির্ধারণ করে যা সেগুলোর এক একটাকে চিহ্নিত করে।

তাতে নির্মাতাকে এক সংজ্ঞায় ও মাধ্যমটা আলাদা সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা হয়। তাদের মতে, "যার কর্তৃক" সূত্রটা নির্মাতাকে মানায়: কেননা তারা এটা বলে যে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা হয়, মঞ্চাসন নির্মাতা কর্তৃক নির্মিত হয়; অন্য দিকে, "যার দ্বারা" সূত্রটা মাধ্যমকে মানায়: কেননা বাইস, তুরপুন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দ্বারা কাজটা সম্পাদিত হয়। একই প্রকারে তারা "যার থেকে" সূত্রটাও জড় পদার্থের স্বীয় সংজ্ঞা বলে নির্দেশ করে: কেননা একটা জিনিস কাঠ থেকে নির্মিত হয়। আরও, "যা অনুসারে" বলতে কারিগরের সামনে রাখা নমুনা বা নকশা বোঝায়। কেননা, হয় কারিগর নমুনার ছাপ নিজের মনে ভাল মত রেখে ধারণাটা কর্মে পরিণত করেছে, না হয়, তার সামনে রাখা নকশাকে লক্ষ ক'রে সে নিজের কর্ম সেই নকশার সাদৃশ্যে চালনা করে। তারা "যার খাতিরে" সূত্রটা লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে সমর্থন করে: কেননা মঞ্চাসনটা লোকদের উপকারার্থেই নির্মিত হয়। "যার মধ্যে" সূত্রটা কাল ও স্থান নির্দেশ করে; [উদাহরণ স্বরূপ], এটা কখন তৈরি হল? তা এসময়ে তৈরি হল। এটা কোথায় তৈরি হল? তা এখানে তৈরি হল। যা তৈরি হচ্ছে, এসমস্ত অবস্থা-পরিস্থিতি যদিও তাতে কিছুই যোগ না করে, তবু এ নিঃসন্দেহের বিষয় যে, সেই সমস্ত অবস্থা-পরিস্থিতি বাদে জিনিসটা তৈরি করা সম্ভব হত না। কেননা কারিগরের জন্য বিশেষ কাল ও বিশেষ স্থান দরকার। এসমস্ত এমন কিছু যা সেই লোকেরা শিখেছে ও পছন্দ করেছে; এসমস্ত এমন পর্যবেক্ষণ যা অসার ও শূন্য চালাকি দ্বারা সম্পাদিত ও যা তারা [পবিত্র] আত্মা সংক্রান্ত সরল ও অকৃত্রিম তত্ত্বে আরোপ করে যাতে একদিকে লোগোস-বাণী-ঈশ্বরকে অবনমিত করতে পারে ও অন্যদিকে পবিত্র আত্মাকে বাতিল করতে পারে। কেননা তারা বিশ্বপ্রভুকে সেই সংজ্ঞা আরোপ করে যা বহিরাগত চিন্তবিদদের দ্বারা প্রাণহীন যন্ত্রপাতির জন্য বা একেবারে নিকৃষ্ট হাতের কাজের জন্য সংরক্ষিত: আমি তো "যাঁর দ্বারা" সূত্রটার কথা বলছি; এবং খ্রিষ্টিয়ান হওয়া সত্ত্বেও তারা সৃষ্টির নির্মাতাকে এমন সূত্র আরোপ করে যা একটা করাত বা একটা হাতুড়ির জন্য উপযোগী।

৪র্থ অধ্যায়। এসমস্ত সূত্র শাস্ত্রের বেলায় অপ্রাসঙ্গিক।

৬। সত্যের লোগোস-বাণীও যে এ ধরনের সূত্র প্রায় ব্যবহার করেন, তা আমরা মেনে নিই। আমরা এমনটা বলছি না যে, [পবিত্র] আত্মার স্বাধীনতা একেবারে বহিরাগত চিন্তাবিদদের মানসিক সঙ্কীর্ণতার বন্দি, বরং যেভাবে সবসময় ঘটে সেই অনুসারে এটা বলি যে, শাস্ত্র অবস্থা-পরিস্থিতি অনুসারে প্রয়োজন অনুযায়ী সূত্র বদলায়। যাই হোক, এই চিন্তাবিদদের অভিমত অনুসারে যেমন, সেই অনুসারে "যাঁর থেকে" সূত্রটা কখনও জড় পদার্থকে নির্দেশ করে না; বরং শাস্ত্র সাধারণত সূত্রটা পরম কারণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে; যেমন, *মাত্র এক ঈশ্বর আছেন যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়* (ক); আরও, *সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত* (খ)। সত্যের লোগোস-বাণীও জড় পদার্থ ক্ষেত্রে এ সূত্র প্রায়ই ব্যবহার করেন, কেননা তিনি বলেন, *তুমি অক্ষয়শীল কাঠ থেকে জাহাজটা তৈরি করবে* (গ); আরও, *তুমি খাটি সোনা থেকে দীপাধারটা তৈরি করবে* (ঘ), এবং *প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়* (ঙ), এবং *আমিও আপনার মত, আমাকেও মাটি থেকে গড়া হয়েছে* (চ)। কিন্তু, আমরা যেমন বলেছি, সেই অনুসারে এরা স্বরূপের পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্য, নিয়ম হিসাবে এটা স্থির করেছে যে, এ সূত্রটা কেবল পিতাকেই মানায়। এবং নিজেদের পর্যবেক্ষণের নিয়মাবলি বাইরে থেকে নেওয়া সত্ত্বেও ও সেই নিয়মাবলির বশ্যতা অক্ষরে অক্ষরে স্বীকার না করেও, নিজেদের সেই নিয়ম পালন ক'রে তারা পুত্রকে মাধ্যম সূত্রটা ও [পবিত্র] আত্মাকে স্থান সূত্রটা আরোপ করল। কেননা তারা "[পবিত্র] আত্মায়" ও "পুত্রের দ্বারা" বলে থাকে। বহিরাগত লোকদের আর পালন না ক'রে কিন্তু, তারা যেইভাবে বলে, প্রৈরিতিক ঐতিহ্যের অনুরূপ হয়ে "যাঁর থেকে" সূত্রটা ঈশ্বরকে আরোপ করল, কেননা সেই অনুসারে বলা হয়েছিল, *তাঁরই থেকে তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে* (ছ) ও *সবই ঈশ্বর থেকে উদ্গত* (জ)। শব্দাবলি সংক্রান্ত এ আলোচনার ফলাফল কী? কারণের স্বরূপ একটা, মাধ্যমের স্বরূপ আর একটা, স্থানের স্বরূপও আর একটা: সুতরাং, যেহেতু কারিগরের চেয়ে যন্ত্রপাতি ভিন্ন, সেজন্য পুত্র স্বরূপে পিতা থেকে ভিন্ন। এবং পবিত্র আত্মাও ভিন্ন যেহেতু স্থান বা কালও যন্ত্রপাতির স্বরূপ থেকে পৃথক ও তাদেরও থেকে পৃথক যারা সেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।

৫ম অধ্যায়। "যাঁর দ্বারা" সূত্রটা পিতার বেলায়ও ব্যবহৃত, এবং "যাঁর থেকে" সূত্রটা পুত্র ও পবিত্র আত্মার বেলায়ও ব্যবহৃত।

৭। এসমস্তই তাদের কল্পিত ধারণা। আমরা যা আগে বলে এসেছিলাম, তা এখন প্রমাণিত করব, তথা, "যাঁর থেকে" সূত্রটা নিজের জন্য সংরক্ষণ করায় পিতা "যাঁর দ্বারা" সূত্রটা পুত্রের কাছে রেখে যাননি; একই প্রকারে, ওদের নিয়ম অনুসারে, পুত্র যে পবিত্র আত্মাকে "যাঁর থেকে" ও "যাঁর দ্বারা" সূত্র দু'টোর সহভাগী করতে অস্বীকার করেন তাও আমরা খণ্ডন করব: কেননা সূত্র সংক্রান্ত তাদের নবীন বণ্টন ঠিক তাই নির্ধারণ করে। *মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়; এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়* (ক)। এ এমন কথা নয় যা নিয়ম দানকারী ব্যক্তির উচ্চারিত কথা, কিন্তু এমন ব্যক্তিরই কথা যিনি হিপোস্তাসিসদের (খ) মধ্যে স্পষ্টভাবেই প্রভেদ রাখেন। প্রেরিতদূত স্বরূপের ভিন্নতা প্রবেশ করাবার জন্যই যে তেমন ঘোষণা করেছেন এমন নয়, তিনি বরং পিতা ও পুত্র বিষয়ক অস্পষ্ট-নয় ধারণা স্থির করার লক্ষ্যেই তেমন ঘোষণা করেছেন। তবে, এ থেকে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, সূত্রগুলো পরস্পর বিরোধী নয়, ও সূত্রগুলো যাঁদের নির্দেশ করে তাঁদের স্বরূপ পরস্পর বিরোধী বলে উপস্থাপন করার লক্ষ্যেই যে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই যেন বিরোধী বাহিনীর বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাও নয়। ধন্য পল সূত্র দু'টোকে একমাত্র ও একই ধারায় একযোগে মিলিত করেছেন যেইভাবে তিনি নিজে বলেন, *সমস্ত কিছু তাঁরই থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য* (গ)। যে কেউ বাক্যের অর্থের দিকে একটু মাত্রও মনোযোগ দিত, সে মেনে নিত, বাক্যটা স্পষ্টভাবে প্রভুকেই লক্ষ করে। এবং *কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?* (ঘ)। ইশাইয়ার এ ভাববাণী থেকে এ পদ আগে উপস্থাপন করার পর প্রেরিতদূত বলে চলেন, '*সমস্ত কিছু তাঁরই থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য*'। এ নবীয় বাণী যে নিখিল সৃষ্টির নির্মাতা সেই ঈশ্বরের লোগোস-বাণীকে লক্ষ করে, তা তুমি পরবর্তী কথা দ্বারা বুঝতে পার তথা, *নিজ করতলে কেবা মেপেছে জলরাশি, বিঘত দিয়ে নিরূপণ করেছে আকাশমণ্ডল ও এক মাপপাত্রে ধরে রেখেছে পৃথিবীর ধুলা? কেবা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছে পাহাড়পর্বত, তুলাদণ্ডে উপপর্বত সকল? প্রভুর আত্মাকে কেইবা দিয়েছে নির্দেশ, কিংবা পরামর্শদাতা*

রূপে তাঁকে কেইবা দিয়েছে জ্ঞান? (ঙ)। এই পদে 'কেইবা' বলতে একদম অসাধ্য কিছু বোঝায় না, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই বোঝায় যেইভাবে এ পদে প্রদর্শিত, '*দুষ্কর্মাদের বিরুদ্ধে কেইবা উঠে দাঁড়াবে আমার পক্ষ হয়ে?*', '*কেইবা সেই মানুষ জীবনই যার অভিলাষ?*', '*কেইবা প্রভুর পর্বতে গিয়ে উঠবে?*' (চ)। তেমনি এখানেও, *কেইবা জানে প্রভুর মন, ও কেইবা তাঁর সিদ্ধান্তের সহভাগী?* (ছ), আরও, *পিতা পুত্রকে ভালবাসেন ও তাঁকে সবকিছু প্রকাশ করেন* (জ)। তিনিই পৃথিবী ধারণ করে আছেন ও তা করতলে ধরে রাখেন; তিনিই তা সুবিন্যস্ত ও সঙ্গতিময় অবস্থায় রক্ষা করেন; তিনিই পাহাড়পর্বতকে সাম্য, জলরাশিকে সীমা, ও জগতে যা কিছু আছে তা স্বীয় স্বীয় অনুক্রম সম্পূর্ণরূপে প্রদান করেছেন। তিনি গোটা আকাশমণ্ডলকে নিজের সর্বশক্তিমত্তার সেই ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা বেষ্টন করেন যা নবীর বাণী রূপক-ভাষায় 'করতল' বলে ডাকে। সেজন্য প্রেরিতদূত ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত যে, 'সমস্ত কিছু তাঁরই থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য'। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমে সমস্ত জীব "তাঁরই থেকে" নিজ নিজ অস্তিত্বের কারণ-প্রাপ্ত। সকল জীব "তাঁরই দ্বারা" নিজ নিজ ধারাবাহিকতা ও অস্তিত্বশীলতা প্রাপ্ত: অর্থাৎ তাঁরই থেকে যিনি সবই সৃষ্টি করেছেন ও প্রতিটি সৃষ্টজীবের রক্ষার লক্ষ্যে প্রতিটি প্রাণীকে সবই মঞ্জুর করেন। এজন্যই অন্তহীন বাসনায় সবকিছু তাঁর প্রতি দৃষ্টি ফেরায় ও অনির্বচনীয় ভালবাসায় জীবনের প্রণেতা ও রক্ষাকর্তার দিকে চোখ তোলে, যেইভাবে লেখা আছে, '*সকল জীব তোমার দিকে চেয়ে আছে*' ও '*তুমি যেই খোল হাত, যত জীবের বাসনা পূর্ণ কর*' (ঝ)।

৮। আমাদের বিপক্ষরা আমাদের এ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তবে কোন্ যুক্তি এমনটা হতে দেবে যেন তারা নিজেদেরই বিরুদ্ধে স্পষ্ট অসঙ্গতিতে পতিত না হয়? "যাঁর থেকে", "যাঁর দ্বারা" ও "যাঁর জন্য" সূত্রত্রয় যে প্রভুকেই লক্ষ করে তারা তা মেনে নিতে সম্মত না হলে তবে সূত্রত্রয় পিতা ঈশ্বরেই আরোপিত হতে হবে; এর ফলে তাদের ধারণা অবশ্যই আর দাঁড়াবে না। কেননা তেমনটা হওয়ার ফলে "যাঁর থেকে" সূত্রটা শুধু নয়, কিন্তু "যাঁর দ্বারা" সূত্রটাও পিতাকে আরোপিত হবে। তবে, এ শেষ সূত্রটা অবমাননাসূচক কোনও অর্থ বহন না করলে তাহলে তারা কেন এমনটা বলে যে, সূত্রটা পুত্রতে আরোপ করলে তা পুত্রের অবমাননার চিহ্ন হয়? সূত্রটা যদি সত্যিকারে

দাসত্বের অবস্থা নির্দেশ করে, তাহলে তারা এতে আমাদের জবাব দিক: গৌরবের ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের পিতা যিনি, তিনি কোন্ মহাপ্রতাপের দাস? এইভাবে তারা নিজেদের দ্বারা নিজেদের খণ্ডন করে, কিন্তু আমরা উভয় ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তি রক্ষা করি। পদটা পুত্রকে নির্দেশ করে, যদি এমন ধারণাই সমর্থন পায় তবে এটা দাঁড়াবে যে "যাঁর থেকে" সূত্রটা পুত্রকে মানায়; এবং যে কেউ এমনটা চেষ্টা করবে যাতে নবীর বাণী ঈশ্বরকে আরোপ করা হয়, তাহলে তাকে এটাও মেনে নিতে হবে যে, "যাঁর দ্বারা" সূত্রটাও ঈশ্বরকে মানায় যার ফলে সূত্র দু'টো একই মর্যাদা বহন করে যেহেতু দু'টোই সমান ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ পথ দিয়েও উভয় সূত্র সমান ভাবে সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য হবে যেহেতু একমাত্র ও একই 'প্রসোপোন' [πρόσωπον - ব্যক্তিকে] নির্দেশ করে। কিন্তু এসো, আমাদের বক্তব্যে ফিরে যাই।

৯। এফেসীয়দের কাছে লিখতে গিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর থেকে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে* [ক]। এবং যারা একমাত্র জনিতজন সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী নয়, কলসীয়দের কাছে পত্রে তিনি তাদের বলেন, *সে [অর্থাৎ খ্রিষ্টকে যে চেনে না] সেই মাথাকে আঁকড়ে ধরে না, যাঁর থেকে গোটা গ্রন্থি ও বন্ধনের মধ্য দিয়ে পুষ্ট ও সুসংহত হয়ে ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত বৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে* [খ]। অন্য দিকে, খ্রিষ্ট যে মণ্ডলীর মাথা, তা আমরা তখনই শিখি যখন প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেই মণ্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন* [গ], ও *আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি* [ঘ]। প্রভু নিজেও বলেন, *যা আমার, তাই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন* [ঙ]। এক কথায়, মনোযোগী পাঠক এমনটা উপলব্ধি করবে যে, "যাঁর থেকে" সূত্রটা নানা ভাবে ব্যবহৃত; বাস্তবিকই প্রভুও বলেন, *আমি টের পেয়েছি, আমা থেকে শক্তি বের হয়েছে* [চ]। একই প্রকারে আমরা এটা লক্ষ করেছি যে, "যাঁর থেকে" সূত্রটা বহু পদে পবিত্র আত্মার বেলায়ও ব্যবহৃত। কেননা তিনি বলেন, *আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল* [ছ]। এবং যোহন বলেন, *এতেই আমরা জানতে*

পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে আছেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা থেকে (জ)। এবং সেই দূত বলেছিলেন, *তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মা থেকে হয়েছে* (ঝ)। প্রভুও বলেন, *আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মাই* (ঞ)।

১০। এখন এটাই প্রমাণ করতে হবে যে শাস্ত্র "যাঁর দ্বারা" সূত্রটা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার বেলায় সমান ভাবে গ্রহণ করে নেয়। পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত সাক্ষ্যসমূহ উপস্থাপন করা তো অবশ্যই নিষ্প্রয়োজন, কেননা এক্ষেত্রে সূত্রটা বিপক্ষদের দ্বারাও ব্যবহৃত। কিন্তু আমরা এটা প্রমাণ করতে পারি যে "যাঁর দ্বারা" সূত্রটা পিতাতেও আরোপিত: শাস্ত্রে বলে, *পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশ্যে যাঁর দ্বারা তোমাদের আহ্বান করা হয়েছে, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত* (ক); আরও, *আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা খ্রিষ্ট যিশুর প্রেরিতদূত* (খ)। আরও, *সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বর দ্বারা উত্তরাধিকারীও* (গ); আরও, *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে [ইত্যাদি]* (ঘ)। ইশাইয়াও বলেন, *ধিক্ তোমাদের, যারা প্রভু দ্বারা নয় কিন্তু গোপনে মতলব করছ* (ঙ)। কিন্তু সূত্রটা যে পবিত্র আত্মার বেলায় ব্যবহৃত, সেবিষয়েও বহু সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রেরিতদূত বলেন, *আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন* (চ); এবং অন্যত্র তিনি বলেন, *মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, পবিত্র আত্মা দ্বারা তা রক্ষা কর* (ছ); আরও, *সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা* (জ)।

১১। "মধ্যে" পদাংশ [বা সমরূপ অন্য ব্যবহার যেমন, "ঈশ্বরের মধ্যে" ও "ঈশ্বরে" ইত্যাদি সমার্থক উক্তি] বিষয়েও আমাদের একই কথা বলতে হবে, কেননা শাস্ত্র পিতা ঈশ্বরের বেলায়ও সেই সূত্র মেনে নেয়, যেমন পুরাতন নিয়মে শাস্ত্রে বলে, *ঈশ্বরে আমরা পরাক্রম সাধন করব* (ক)। আরও, *তোমাতেই আমার অবিরত প্রশংসাবাদ* (খ)। আরও, *আমি তোমার নামে উল্লাস করব* (গ)। পলের পত্রে শাস্ত্রে বলে, *নিখিলের স্রষ্টা ঈশ্বরে [ইত্যাদি]* (ঘ); আরও, *আমরা, পল, সিল্ভানুস ও তিমথি, আমাদের পিতা ঈশ্বরে [আশ্রিত] থেসালোনিকীয় মণ্ডলীর সমীপে* (ঙ)। আরও, *যেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি কোন প্রকারে তোমাদের কাছে যেতে অবশেষে সুযোগ পেতে পারি* (চ); আরও, *তুমি … ঈশ্বরে গর্ব করে থাক* (ছ)। এবং এক্ষেত্রে পদগুলোর সংখ্যা এত বহুসংখ্যক যা গণনা

করা সহজ নয়। বহুসংখ্যক সাক্ষ্য উপস্থাপন করা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু আমাদের বিপক্ষদের অভিযোগ যে যুক্তিসঙ্গত নয় এটাই আমাদের লক্ষ্য। এ ধরনের ব্যবহার যে প্রভু ও পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা জানা কথা ব'লে আমি শুধু প্রমাণ করায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করব না। বরং এটাই বলা দরকার যে, বুদ্ধিমান শ্রোতার পক্ষে, উপস্থাপিত ধারণাসমূহের সেই সমালোচনাই যথেষ্ট যা 'বিপরীত' পদ্ধতি প্রয়োগ থেকে উৎপন্ন সমালোচনা। কেননা উক্তির ভিন্নতা যদি তাদের অভিমতে স্বরূপের পরিবর্তন নির্দেশ করে, তাহলে এখন উক্তির সমতা আমাদের বিপক্ষদের একথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, সত্তা অভিন্ন হয়ে থাকল।

১২। থেওলোগিয়ায় (ক) এসমস্ত সূত্র-ব্যবহারের যে পরিবর্তন হতে পারে তা শুধু নয়; বরং উভয় সূত্রের নির্দেশিত বাস্তবতা ক্ষেত্রে, যখন একটা সূত্র অন্যটার অর্থ ধারণ করে তখন সূত্র দু'টো প্রায়ই পারস্পরিক ভাবে একটার অপরটার ভূমিকা ধারণ করে। উদাহরণ যোগে, আদম যখন ঘোষণা করেন *আমি ঈশ্বর দ্বারা একটা মানুষকে কিনেছি* (খ), তখন তিনি অর্থটা বজায় রেখে 'ঈশ্বর থেকে'ও বলতে পারতেন। অন্য এক পদে, *মোশি প্রভুর আদেশ দ্বারা ইস্রায়েল সন্তানদের যা যা আজ্ঞা করেছিলেন [ইত্যাদি]* (গ); আরও, *অর্থ দেওয়ার শক্তি কি ঈশ্বর দ্বারা হয় না?* (ঘ)। কারারুদ্ধদের সঙ্গে স্বপ্ন বিষয়ে কথা বলে যোসেফ নিজেও 'ঈশ্বর থেকে' না বলে বরং স্পষ্টভাবে 'ঈশ্বর দ্বারাই' বলেছিলেন। অপরদিকে পল "যাঁর দ্বারা" এর বদলে "যাঁর থেকে" সূত্রটা ব্যবহার করেন যেইভাবে তিনি '[যিশু] নারীর মধ্য দিয়ে নির্মিত' না বলে বরং বললেন, *[যিশু] নারী থেকে নির্মিত* (ঙ)। এবং বিষয়টা তিনি অন্য একটা পদে তখনই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন যখন এটা বলেন যে, নারী যে 'পুরুষ থেকে' সঞ্জাত তা বলা উপযুক্ত, কিন্তু পুরুষ ক্ষেত্রে 'নারীর দ্বারা' সঞ্জাত বলাই উপযুক্ত: তাঁর কথা এ, *যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর দ্বারাই পুরুষের উদ্ভব* (চ)। তথাপি, এখানে পল একই সময় সূত্র-প্রয়োগ ক্ষেত্রে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন ও তা করতে করতে তাদের ভুল সংশোধন করেন যারা মনে করে, প্রভুর দেহ আত্মিক। ঈশ্বর-বহনকারী তাঁর মাংস যে মানবীয় '*তাল থেকে*' (ছ) গঠিত, তা দেখাবার জন্য তিনি আরও বেশি অর্থপূর্ণ শব্দই ব্যবহার করতে পছন্দ করেছিলেন। কেননা 'নারীর দ্বারা' উক্তিটা এমন ধারণা বোঝাতে

পারত কেমন যেন প্রজননটা ছিল একটা স্থানান্তরের মত; কিন্তু ‘নারী থেকে’ উক্তিটা যথেষ্ট স্পষ্টতার সঙ্গে দেখায় যে, জনিতজন ও জননীর মধ্যকার স্বরূপ এক। তাই তিনি নিজেকে অস্বীকার না করে এমনটা দেখালেন যে, সেই সূত্রগুলো সহজে পরস্পর সমরূপ বলে ব্যবহৃত। সুতরাং, যে নামগুলোর জন্য “যাঁর দ্বারা” সূত্রটা উচিত ও ব্যবহার্য বলে নির্ধারিত, যখন সেই নামগুলো ক্ষেত্রে “যাঁর দ্বারা” সূত্রটার স্থানে “যাঁর থেকে” সূত্র স্থান পেল, তখন ধর্মভক্তি বিকৃত করার লক্ষ্যে একটা সূত্রকে অন্য সূত্র থেকে একেবারে পৃথক করার কোন্ কারণ রয়েছে?

৬ষ্ঠ অধ্যায়। যারা বলে, পুত্র পিতার সঙ্গে নন কিন্তু পিতার পরে আছেন, তাদের এই ধারণার প্রতিবাদ। একই সময় গৌরব সংক্রান্ত ধারণাও আলোচিত।

১৩। আমাদের বিপক্ষরা তত নৈপুণ্য ও তত শঠতার সঙ্গে নিজেদের লক্ষ্য সমর্থন করা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে তাদের পক্ষে অজ্ঞতা-অজুহাত উত্থাপন করা আদৌ সম্ভব নয়। তারা তো প্রকাশ্যেই আমাদের প্রতি এতেই বিরক্তি দেখায় কারণ আমরা পিতার “সঙ্গেই” একমাত্র জনিতজনের গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ শেষ করি এবং পবিত্র আত্মাকে পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করি না। তারা আমাদের নবীনত্বের নির্মাতা ও কারিগর ও নতুন নতুন শব্দের উদ্ভাবক বলে অভিহিত করে। তাছাড়া, তারা আরও কতই না অসম্মানসূচক নাম দিয়ে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে না? তেমন অপমান ক্ষেত্রে আমি নিজেকে অপমানিত মনে করা থেকে এতই দূরে রয়েছি যে, তারা নিজেদের প্রতি যে ক্ষতি ঘটায় তা যদি আমাদের অবিরত দুঃখ না এনে দিত, তবে তাদের সকলকে সুখের বাহক বলে প্রায়ই ধন্যবাদ জানাতাম। বাস্তবিকই প্রভু বলেন, *তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে* (ক)। যে বিষয়ে তারা (খ) বিরক্তি বোধ করে তা এ: তারা বলে, পুত্র পিতার “সঙ্গে” নন, কিন্তু পিতার “পরে” আছেন। এর ফলে এটা দাঁড়ায় যে, “পুত্র-সহ” নয় কিন্তু তাঁর “দ্বারাই” পিতাকে গৌরব আরোপ করা হয়। কেননা “তাঁর সঙ্গে” বা “তাঁর সহ” সূত্রটা সম্মানের সমতা প্রকাশ করে, কিন্তু “তাঁর দ্বারা” সূত্রটা বশ্যতা বোঝায়। আরও, তারা নাকি বলে, পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে নয় কিন্তু পিতা

ও পুত্রের নিম্নেই স্থান দিতে হয়, কেননা পবিত্র আত্মা “সহঅনুক্রমিত” নন কিন্তু “উপঅনুক্রমিত”; তিনি “সহগণিত” নন বরং “উপগণিত” (গ)। তেমন নিপুণ পরিভাষা দ্বারা তারা বিশ্বাসের সরলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা বিকৃত করে, এবং এর ফলে তাদের মধ্যে কেইবা অজ্ঞতা-অজুহাত দ্বারা উপকৃত হতে পারবে যখন তত ব্যস্ততা দেখিয়ে অন্যকে অজ্ঞ হতে দেয় না?

১৪। আমরা তাদের কাছে সর্বপ্রথমে এটাই জিজ্ঞাসা করব: তারা কোন্ অর্থে এটা বলে যে, পুত্র ‘পিতার পরে’ আছেন? তিনি কি কাল ক্ষেত্রে, অনুক্রম ক্ষেত্রে, নাকি যোগ্যতা ক্ষেত্রে পরবর্তী? তিনি কাল ক্ষেত্রে পরবর্তী হলে তবে এমন কেউই নেই যে এমনটা ঘোষণা করবে, যুগগুলোর প্রবর্তক যিনি তিনি পরবর্তী, কেননা পিতার সঙ্গে পুত্রের সংযোগ ক্ষেত্রে কালের কোনও বিরতি কোনও বাধা সৃষ্টি করে না। পুত্র যে মানব-ব্যাপারের স্বীয় ধারণা অনুসারে পিতার পরবর্তী, তাও বলা যেতে পারে না: তাঁরা যে নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কে সমকালীন ভাবে নিজেদের ধারণ করেন শুধু এ কারণে নয়, কিন্তু এ কারণেও যে, কাল ক্ষেত্রে সেই সমস্ত কিছু পরবর্তীকালীন বলা হয় যা বর্তমানকাল থেকে কম দূরে রয়েছে, এবং অন্যদিকে তা পূর্বকালীন বলা হয় যা বর্তমানকাল থেকে অধিক দূরে রয়েছে। উদাহরণ যোগে, নোয়ার ঘটনাগুলো সদোমের ঘটনাগুলোর তুলনায় পূর্ববর্তী যেহেতু সেগুলো বর্তমানকাল থেকে অধিক দূরবর্তী, ও এগুলো সেগুলোর তুলনায় পরবর্তী যেহেতু এগুলো বর্তমানকালের অধিক নিকটবর্তী বলে প্রতীয়মান। কিন্তু যে জীবন যেকোন কাল ও যুগ অতিক্রম করে, সেই জীবনকে বর্তমানকাল থেকে দূরত্ব দ্বারা পরিমাপ করা, তা কি অভক্তি শুধু নয় কিন্তু ক্ষিপ্ততার আতিশয্যও বলে গণ্য নয়? কেননা, যখন যা কিছু জন্ম ও মৃত্যু সাপেক্ষ, তা পারস্পরিক তুলনা অনুসারে যেমন পূর্ববর্তীকালীন বা পরবর্তীকালীন বলে অভিহিত, তখন তেমনি, একই প্রকারে, এমনটা কি বলা যেতে পারবে যে, সমানুপাতিক দিক দিয়ে পিতা ঈশ্বর যুগগুলোর প্রভু সেই পুত্র-ঈশ্বরকে অতিক্রম করেন? কিন্তু অতীতকাল ক্ষেত্রে পিতার প্রাধান্য অনুমানযোগ্য নয়, কেননা কোনও ধারণা বা কোনও চিন্তাও প্রভুর [অনাদিকালীন] প্রজনন পর্যন্ত নিজেকে বিস্তৃত করতে পারে; যোহন নিজের ধারণাকে স্থিরীকৃত সীমার মধ্যে উত্তমরূপে সীমাবদ্ধ করেছিলেন যখন দু'টো শব্দ প্রয়োগে

বলেছিলেন, ‘*আদিতে ছিলেন*’ *বাণী* (ক)। মানব ধারণা এই ‘ছিলেন’ [কাল] পর্যন্ত যেতে অক্ষম; মানব কল্পনাও এই ‘আদি’ অতিক্রম করতে অক্ষম। তোমার চিন্তায় তুমি যত অতীতে যাও না কেন, সেই ‘ছিলেন’ অতিক্রম করতে পারবে না, এবং পুত্রের অতীতে যে কী রয়েছে তা দেখবার জন্য তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, সেই ‘আদি’ও অতিক্রম করতে পারবে না। সুতরাং, পিতার সঙ্গে পুত্রকে এইভাবে ভাবা-ই ধর্মভক্তি সম্মত।

১৫। আর যদি তারা পিতার চেয়ে নিম্নস্থিত এমন স্থানে পুত্রের এক প্রকার অবরোহণের কথা কল্পনা করে যাতে করে পিতা ঊর্ধ্বে বসে আছেন ও তাঁর পাশাপাশি কিন্তু নিচেই পুত্র আসন নেন, তাহলে তারা তা স্পষ্ট ভাবে বলুক, আর আমরা তেমন অদ্ভুত প্রমাণের সামনে চুপ করে থাকব। নিজেদের যুক্তিবিচারে তারা সঙ্গতিও রক্ষা করে না, কারণ পিতাকে গোটা বিশ্ব ভেদ করতে দেয় না, অথচ সুবুদ্ধির মানুষদের মতে ঈশ্বর সবকিছু পূরণ করে থাকেন। নবীর এ কথাও তারা মনে রাখে না, কেননা তিনি বলেন, *স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পাতালে যদি নেমে যাই, দেখ, সেখানেও তুমি উপস্থিত* (ক); অথচ তারা ঊর্ধ্ব ও নিম্ন স্থান পিতা ও পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেয়। কিন্তু আমরা তাদের রূঢ়তার প্রমাণ বিষয়ে কিছু বলব না, বাস্তবিকই তারা বিদেহী জীবদের জন্য একটা স্থান বণ্টন করে; যাই হোক, তারা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-বিরোধিতা চালায় তা এমন দুঃসাহসী যে তারা ‘*আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর*’ ও ‘*তিনি ঈশ্বরের মহিমার ডান পাশে আসন নিয়েছেন*’ (খ) বচনগুলোও উল্লেখ করে। কেননা ‘ডান পাশ’ বলতে নিম্নস্থল বোঝায় না (অথচ তারা ঠিক তাই সমর্থন করে), কিন্তু সমতার সম্পর্কই বোঝায়; দৈহিক ক্ষেত্রে যেমন, সেই অনুসারেও তা বুঝতে নেই, কারণ তেমনটা হলে তবে ঈশ্বরে বাঁ পাশও থাকত। কোন একজনের পাশে বসতে যে সম্মান প্রতীকমূলক ভাবে নির্দেশিত, সেই অনুসারে ‘ডান পাশ’ উক্তিটা পুত্রে আরোপিত সম্মানের মহিমা প্রদর্শন করে। তবে বাকি এ বিষয়ই এখনও থেকে গেছে: তারা এটা ঘোষণা করে যে, “দ্বারা” শব্দের মধ্য দিয়ে যোগ্যতার নিম্নপদ নির্দেশিত। তাই তারা এটা শিখে নিক যে খ্রিষ্ট হলেন ‘*ঈশ্বরের পরাক্রম, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা*’ (গ), ‘*অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি*’ (ঘ) ও ‘*তাঁর গৌরবের প্রতিবিম্ব*’ (ঙ), এবং পিতা ঈশ্বর তাঁকে নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন ও তাঁর মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছেন। এসমস্ত সাক্ষ্যবাণী ও

এগুলোর অনুরূপ যে অন্যান্য সাক্ষ্যবাণী গোটা শাস্ত্রে পাঠ করা যেতে পারে, সেগুলো বিষয়ে আমরা কি এমনটা বলতে পারি যে তেমন সাক্ষ্যবাণী অবমাননা ব্যক্ত করে? বরং এ সাক্ষ্যবাণীগুলো কি ঘোষকেরই মত সেই একমাত্র জনিতজনের মহিমা ও পিতার সঙ্গে তাঁর গৌরবের সমতা প্রকাশ্যে প্রচার করে না? তারা স্বয়ং প্রভুকেই শুনুক, কেননা তিনি তখনই পিতার গৌরবের সমান স্বগৌরব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন যখন বলেন, '*যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে*' (চ), '*যখন পুত্র পিতার গৌরবে আসবেন [ইত্যাদি]*' (ছ), '*যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে*' (জ), '*আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম; এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব*' ও '*সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর যিনি পিতার বুকে বিরাজমান*' (ঝ)। এসমস্ত বচন একেবারে মূল্যায়ন না করে তারা পুত্রকে সেই স্থান বণ্টন করে যা তাঁর শত্রুদের জন্য নিরূপিত। পিতার বুক এমন আসন যা পুত্রের যোগ্য (ঞ), কিন্তু পাদপীঠের স্থান তাদেরই জন্য যাদের এখনও বশীভূত করা হয়নি। কিন্তু আমরা যারা অন্য কিছুর দিকে ধাবিত, সেই আমরা সেই সমস্ত সাক্ষ্যবাণী হালকা ভাবে স্পর্শ করেছি; কিন্তু যদি তুমি তোমার অবসর সময়ে প্রমাণগুলো সংগ্রহ কর তবে সেই একমাত্র জনিতজনের গৌরবের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে ও তাঁর পরাক্রমের আতিশয্যের বিষয়ে একটা ধারণা পেতে পারবে। তবু এখানে উপস্থাপিত সাক্ষ্যগুলো সুবিবেচক শ্রোতার পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়, যদি না সেই শ্রোতা 'ডান পাশ' ও 'বুক' শব্দ দু'টো এমন দৈহিক ও নিম্নস্থানীয় অর্থে বোঝে যার ফলে সে ঈশ্বরকে এক স্থানে গণ্ডিবদ্ধ করবে ও একটা রূপ, একটা স্থান ও দৈহিক একটা ভঙ্গি কল্পনা করবে: এ এমন কিছু যা সরল, অসীম ও অশরীরী ধারণা থেকে বহু দূরে; তাছাড়া, ঈশ্বর বিষয়ে এ নিম্ন ধারণা পিতাকে যেমন, তেমনি পুত্রকেও আঘাত আঘাতগ্রস্ত করবে। যে কেউ এইভাবে আলোচনা করে, সে পুত্রকে [ঐশ্বরিক] যোগ্যতা-বঞ্চিত করে না, কিন্তু নিজের উপরে ঈশ্বর-নিন্দা দোষ আকর্ষণ করে; কেননা পুত্রের বিরুদ্ধে যা বলার দুঃসাহস করেছে, তা পিতারও বিরুদ্ধে আরোপ করতে বাধ্য হবে। কেননা যে কেউ প্রাধান্য হিসাবে পিতাকে সর্বোচ্চ স্থান আরোপ করে ও সেইসঙ্গে এটা বলে যে, একমাত্র জনিত পুত্র নিম্নতর স্থানে বসে রয়েছেন, সে সেই সমস্ত শারীরিক ফলাফল বহন করবে যা তার কল্পনা থেকে উদ্গত।

এবং যদি এসমস্ত কল্পনা হলো মাতাল মানুষের ও ক্ষিপ্ততার নাগাল পেয়েছে এমন মানুষদেরও উন্মাদনা, তাহলে, যারা পুত্রের দ্বারা এ সতর্কবাণী পেয়েছিল যা অনুসারে *পুত্রকে যে সম্মান করে না সে পিতাকে সম্মান করে না* (ট), যিনি স্বরূপে, গৌরবে ও যোগ্যতায় পিতার সঙ্গে মিলিত, তারা যে পিতার সঙ্গে তাঁকেও উপাসনা করবে না ও তাঁকে গৌরব আরোপণ করবে না, তেমন আচরণ কেমন করে ধর্মভক্তির অনুরূপ আচরণ হতে পারবে? এবিষয়ে আমরা আর কী বলব? যখন প্রভু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন তিনি পিতার গৌরবে আসবেন, যখন স্তেফান *ঈশ্বরের ডান পাশে যিশুকে দাঁড়াতে* (ঠ) দেখেছেন, যখন পল [পবিত্র] আত্মায় খ্রিষ্টের বিষয়ে এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে *'তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন'* (ড), যখন পিতা বলেন, *আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর* (ঢ), যখন পবিত্র আত্মা এমনটা ঘোষণা করেন যে তিনি *'ঈশ্বরের মহিমার ডান পাশে আসীন'* (ণ), তখন যিনি সিংহাসনের সম-অধিকারী ও সম্মানে সমান, আমরা যদি সেই পুত্রকে সমতা-অবস্থা থেকে নিম্নাবস্থায় নমিত করি, তাহলে গোটা সৃষ্টির ভয়ঙ্কর ও প্রকাশ্য বিচারালয়ের সামনে কেমন ন্যায্য আত্মপক্ষ সমর্থন উপস্থাপন করতে পারব? আমার মতে, সেই দাঁড়িয়ে থাকা ও আসীন হওয়াটা স্বরূপের স্থিরতা ও সম্পূর্ণ স্থৈর্য নির্দেশ করে, যেইভাবে বারুকও ঈশ্বরের আচরণের অবিচলতা ও অপরিবর্তনশীলতা দেখিয়ে বলেছিলেন, *তুমি নিত্য সমাসীন, আর আমরা নিত্য মরণমুখী* (ত)। অন্যদিকে, 'ডান পাশ' উক্তিটা যোগ্যতায় সম্মানের সমতা নির্দেশ করে। তাই, পুত্রকে গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদের সহভাগিতা-বঞ্চিত করা কি দুঃসাহসিকতা নয়? কেননা তেমনটা হলে তবে তিনি কম সম্মানের স্থানের অধিকারী গণ্য হবার যোগ্য।

৭ম অধ্যায়। তাদেরই বিপক্ষে যারা পুত্রের বিষয়ে "যাঁর সঙ্গে" সূত্রটা অনুপযুক্ত মনে করে কিন্তু "যাঁর দ্বারা" সূত্রটাই উপযুক্ত মনে করে।

১৬। কিন্তু সেই বিপক্ষেরা এটা বলে যে, "তাঁর সঙ্গে" বলাটা একেবারে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ব্যবহার; সেটার বদলে, শাস্ত্রের ভাষায় "তাঁর দ্বারা" সূত্রটাই স্বাভাবিক, ও ভ্রাতাদের মধ্যেও প্রচলিত ব্যবহার। এসমস্ত ঘোষণায় আমরা প্রতিবাদে কি বলব? সুখী সেই কান যা তোমাদের সে কথা শোনেনি, সুখী সেই মন যা তোমাদের আলোচনা থেকে

অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তোমরা যারা খ্রিষ্টকে ভালবাস, আমি সেই তোমাদের বলি, মণ্ডলী সেই উভয় প্রথা মেনে নেয় ও এক একটাকে অন্যটার বিনাশক বলে যেনই অস্বীকার করে না। তারপর, আমরা যখন সেই একমাত্র জনিতজনের স্বরূপের মহিমা ও তাঁর যোগ্যতার শ্রেষ্ঠতা লক্ষ করি, তখন আমরা ঘোষণা করি, তিনি পিতার "সঙ্গে" বা পিতা "সহ" গৌরবের অধিকারী। এবং যখন আমরা তাঁর উপকারসমূহের বদান্যতার কথা ভাবি ও আমাদের জন্য তেমন উপকার যোগাবার লক্ষ্যে তিনি যে কী না ব্যয় করেছেন তাও যখন ভাবি, অথবা যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রবেশাধিকারের কথা ভাবি ও আমরা যে তাঁর পরিবারভুক্ত হবার যোগ্যতা পেয়েছি তাও যখন ভাবি, তখন এটা স্বীকার করি যে, আমরা তেমন অনুগ্রহ তাঁর দ্বারা ও তাঁর মধ্য দিয়েই পেয়েছি। এইভাবে "যাঁর সঙ্গে" সূত্রটা তাকে বেশি মানায় যে "গৌরব" আরোপ করে, ও "যাঁর দ্বারা" সূত্রটা তাকেই বেশি মানায় যে "ধন্যবাদ" জ্ঞাপন করে। তাছাড়া, "যাঁর সঙ্গে" সূত্রটা যে ভক্তজনদের ব্যবহারের বেলায় পরকীয় সূত্র, একথা মিথ্যা। তাই, তারা চরিত্রের দৃঢ়তার খাতিরে নতুনত্বের চেয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রাচীনতা পছন্দ করে পিতৃগণের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণই রক্ষা করল: গ্রামাঞ্চলে থাকুক বা শহরে থাকুক তারা এ সূত্র ব্যবহার করে চলে। কিন্তু যারা প্রথাসমূহ তত সহ্য করে না ও পরম্পরাগত প্রথাগুলোর বিরুদ্ধে ঠিক যেন নিশ্বাদ জিনিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তারা পোশাক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনিই নতুনত্বও সাদরে গ্রহণ করে: যে নিজেকে দেখাতে পছন্দ করে, সে ঐতিহ্যগত চালচলনের চেয়ে সবসময় শেষ চালচলনই পছন্দ করে। তাই তুমি দেখতে পাবে, গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে ঐতিহ্যগত সূত্রটা এখনও ব্যবহৃত। অন্যদিকে, বাক্-বিতণ্ডার জন্য ক্রীড়া-প্রতিযোগীদের মত তেলে মাখা এ ব্যক্তিত্ব সকল, হ্যাঁ, বাক্য-অলঙ্কারে নিপুণ এ ব্যক্তিত্বদের কথাবার্তা নবীন প্রজ্ঞার মুদ্রাঙ্কনে মুদ্রিত। অন্যদিকে আমরা তা-ই পুনরাবৃত্তি করে থাকি যা আমাদের পিতৃগণ বলতেন, তথা: পিতা ও পুত্র একই গৌরবের সহভাগী; তাই আমরা পুত্র "সহই" [বা পুত্রের "সঙ্গেই"] পিতার কাছে আমাদের গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ নিবেদন করি। কিন্তু এটা যে পিতৃগণের পরম্পরাগত ব্যবহার, তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; কেননা আমরা একটু আগে তোমাদের জন্য যে সাক্ষ্যবাণী বিষয়ে আলোচনা করেছি, তাঁরা সেই সাক্ষ্যবাণী থেকে

মূলসূত্র বের ক'রে শাস্ত্রের মন অনুসারে চলেছিলেন (ক)। দীপ্তি সবসময়ই গৌরবের সঙ্গে ও চিত্র নমুনার সঙ্গে ভাবা হয়; তেমনি ভাবে পুত্রকে সব ক্ষেত্রেই পিতার সঙ্গে ভাবা হয়; কেননা শব্দগুলোর অভ্যন্তরীণ সঙ্গতিও তেমন বিচ্ছেদ মানে না, এমনকি বিষয়গুলোর স্বরূপও সেই বিচ্ছেদ সহ্য করে না।

৮ম অধ্যায়। "যাঁর দ্বারা" সূত্রের নানা ব্যবহার; কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে "যাঁর সঙ্গে" সূত্রটা অধিক উপযুক্ত। পুত্র যে কেমন করে আদেশ গ্রহণ করেন ও তিনি যে কেমন করে প্রেরিত হন, তা ব্যাখ্যা করা হয়।

১৭। যখন প্রেরিতদূত '*যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা ঈশ্বরকে*' (ক) ধন্যবাদ জানান ও এমনটা বলেন, তিনি "তাঁর দ্বারা" প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছেন যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে চালিত করেন (খ), অথবা যখন বলেন, *তাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এবং ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি* (গ), তখন তিনি আমাদের প্রতি তাঁরই প্রসন্নতা দেখান যিনি এখন নিজের মধ্য দিয়ে পিতা থেকে আমাদের কাছে উপকারগুলোর দান স্থানান্তর করেন ও পিতার কাছে আমাদের প্রবেশ করান। কেননা যখন তিনি বলেন, 'আমরা তাঁর দ্বারা প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি', তখন তিনি দেখান সেই দানগুলো-মঞ্জুর কোথা থেকে আগত; ও যখন তিনি বলেন, 'তাঁর দ্বারা আমরা এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি', তখন তিনি এটা প্রমাণ করেন যে, আমাদের পক্ষে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও তাঁর পরিবারভুক্ত লোক বলে গৃহীত হওয়া খ্রিষ্টের "দ্বারাই" হয়। যখন মেনে নিই, তাঁর অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে সক্রিয়, তখন কি তাঁর কাছ থেকে গৌরব কেড়ে নিই? এটাই বরং কি অধিক সত্য নয় যে, তাঁর উপকারগুলো-বিবরণ হলো গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ স্বরূপ? এজন্য আমরা সপ্রমাণ করেছি যে, শাস্ত্র প্রভুকে কেবল একটা নাম দিয়ে উপস্থাপন করে না, সেই নামগুলো দিয়েও তাঁকে উপস্থাপন করে না যে নামগুলো কেবল তাঁর ঈশ্বরত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে, কিন্তু [প্রভুকে উপস্থাপন করার জন্য] শাস্ত্র সময় সময় তাঁর স্বরূপের বৈশিষ্ট্যগুলোও ব্যবহার করে। শাস্ত্র তো সেই নাম জানে '*সকল নামের ঊর্ধ্বে যে*

নাম’ [ঘ] তথা ‘পুত্র’ নাম, ও তাঁকে ‘সত্যকার পুত্র’ [ঙ], ‘একমাত্র জনিত ঈশ্বর’ [চ], ‘ঈশ্বরের পরাক্রম’, ‘প্রজ্ঞা’ [ছ] ও ‘লোগোস-বাণী’ [জ] বলে অভিহিত করে। আরও, আমাদের প্রতি তাঁর বিবিধ ধরনের সেই অনুগ্রহের জন্য যা তিনি নিজের মঙ্গলময়তার ঐশ্বর্যে নিজের প্রজ্ঞার অসীম বৈচিত্র্য অনুসারে তাকেই দান করেন যে তা যাচনা করে, শাস্ত্র প্রভুকে অগণন নাম দিয়ে চিহ্নিত করে: তাঁকে সময় সময় পালক [ঝ], সময় সময় রাজা [ঞ], চিকিৎসক [ট], এমনকি বর [ঠ], পথ [ড], দরজা [ঢ], জলের উৎস [ণ], রুটি [ত], কুড়াল [থ] ও শৈল [দ] বলে অভিহিত করে। প্রকৃতপক্ষে এ নামগুলো স্বরূপকে নয়, কিন্তু, যেমন বলেছি, সেই শক্তির সত্যতা মনে করিয়ে দেয় যা তিনি, যারা তা যাচনা করে, আপন সৃষ্টিকর্মের প্রতি দয়ার খাতিরে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে সেই মানুষদের অন্তরে সঞ্চার করেন। যারা তাঁর পরিচালনায় আশ্রয় নিয়েছে ও অমঙ্গলের মধ্যে সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে, তাদের তিনি মেষ বলেন ও নিজেকে তাদের পালক বলে ঘোষণা করেন, কারণ তারা তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রতি বাধ্য হয় ও অপরের কোনও শিক্ষায় মনোযোগ দেয় না। তিনি বলেন, *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়* [ধ]। তিনি তাদেরই রাজা যারা উচ্চতর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে ও তাদের এমন অধিকারের প্রয়োজন আছে যা ন্যায় নিশ্চিত করবে। তিনি দরজা, কারণ নিজের আজ্ঞাগুলোর ধর্মময়তা গুণে মানুষকে সৎকর্ম সাধনে চালনা করেন; তিনি এজন্যও দরজা, কারণ যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস গুণে মঙ্গলকর জ্ঞানে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের তিনি ভরসাভরে বসবাস করতে দেন। এথেকেই উৎপন্ন সেই উক্তি যা অনুসারে *‘কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে, সে ভিতরে যাবে আবার বাইরে আসবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাবে’* [ন]। তিনি শৈল, কারণ তিনি পরাক্রান্ত ও অবিচল রক্ষা, এমন রক্ষা যা বিশ্বাসীদের পক্ষে যেকোন রক্ষাফলক থেকে অলঙ্ঘনীয়। এসমস্ত ক্ষেত্রে “যাঁর দ্বারা” সূত্রটা যথেষ্ট উপযোগী ও অর্থপূর্ণ ব্যবহার উপস্থাপন করে, বিশেষভাবে তখনই যখন তাঁর বিষয়ে দরজা ও পথের কথা ব্যবহৃত। কিন্তু ঈশ্বর ও পুত্র হিসাবে তিনি পিতার “সঙ্গে” [বা পিতা-“সহ”] গৌরবের অধিকারী, কারণ ‘*যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হবে ও পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করবে, যিশু খ্রিষ্টই প্রভু*’ [প]। তাই আমরা দু’টো সূত্র ব্যবহার করি যাতে একটার মধ্য

দিয়ে তাঁর নিজস্ব যোগ্যতা ঘোষণা করি, ও অন্যটার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই অনুগ্রহ ঘোষণা করি যা তিনি আমাদের প্রতি দেখান।

১৮। কেননা "তাঁর দ্বারা" প্রাণদের সাহায্য আসে, এবং প্রতিটি ধরনের উৎকণ্ঠার জন্য বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা স্থির করা হল। যখন তিনি পবিত্রা কুমারীর মত এমন অনিন্দনীয় প্রাণকে নিজের সঙ্গে মিলিত করেন যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা নেই (ক), তখন তিনি বর বলে অভিহিত; কিন্তু যখন তিনি দিয়াবলের অমঙ্গলকর আঘাতে ক্লিষ্ট প্রাণকে গ্রহণ করে নেন ও তার পাপকর্মের গুরুতর দুর্বলতা থেকে নিরাময় করেন, তখন তিনি চিকিৎসক বলে অভিহিত। তবে কি, আমাদের প্রতি তাঁর এসমস্ত উৎকণ্ঠা তাঁর বিষয়ে নিছক মনোভাব আমাদের অন্তরে উৎপন্ন করে? না কি তাঁর সেই নানাবিধ উৎকণ্ঠা ত্রাণকর্তার মহৎ প্রতাপের জন্য ও সেইসঙ্গে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার জন্য আমাদের মনকে বিস্ময়ে উদ্দীপিত করে? কেননা তিনি আমাদের রোগ-ব্যাধির প্রতি সহনশীল হতে মেনে নিলেন ও আমাদের দুর্বলতা পর্যন্ত নেমে আসতে সক্ষম হলেন। স্বর্গ, পৃথিবী, অসীম সাগর, জলে ও স্থলভূমিতে চলে যত প্রাণী, গাছপালা, তারা-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, ঋতু, বিশ্বের বহুবিধ অনুক্রম, এসমস্ত কিছু তাঁর শক্তির শ্রেষ্ঠতা ততখানি প্রমাণ করতে পারে না যতখানি প্রমাণ করতে পারলেন সেই অসীম ঈশ্বর নিজে যিনি যন্ত্রণাবিহীন ভাবে মাংসের দ্বারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করলেন যাতে নিজের যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে আমাদের যন্ত্রণা-বিহীনতা দান করতে পারেন। প্রেরিতদূত অবশ্যই বলেছিলেন *যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, "তাঁরই দ্বারা" আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই* (খ), কিন্তু এ উক্তি দিয়ে তিনি নিম্ন ধরনের সেবাকর্ম নির্দেশ করেন না বরং সেই সহায়তাকে নির্দেশ করেন যা তাঁর পরাক্রমের কর্তৃত্ব দ্বারা সক্রিয়। কেননা তিনি নিজে সেই বলবানকে বেঁধে ফেলেছেন ও তার সবকিছু লুট করে নিলেন (গ) অর্থাৎ সেই সব কিছু কেড়ে নিলেন যা সেই বলবান নিজের সমস্ত অমঙ্গলকর কর্মের জন্য হাতিয়ার করেছিল, এবং আমাদের মধ্যে তাঁর সাধিত ব্যবস্থা দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে প্রভুর কাজের জন্য এমন উপযোগী একটা পাত্র করলেন যা সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত একটা পাত্র (ঘ)। এইভাবে আমরা "তাঁর দ্বারা" পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়েছি, কেননা অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে 'আলোয়

তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার জন্য’ স্থানান্তর করেছি। তাই আমরা যেন পুত্রের দ্বারা স্থাপিত সেই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এমন সেবাকর্ম বলে বিবেচনা না করি যা দাসের সেবাকর্মের সদৃশ হওয়ায় নিম্নধরনেরই অবস্থার সেবাকর্ম, বরং আমরা যেন সেই সেবাকর্ম এমন সেচ্ছাকৃত উৎকণ্ঠা বলে বিবেচনা করি যা পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে মঙ্গলময়তা ও দয়া থেকে উৎসারিত ও পিতা ঈশ্বরের হাতের কাজের প্রতি সম্পাদিত। এর ফলে, তিনি যা কিছু সাধন করেছেন, সেই সব কিছুতে যদি আমরা তাঁর সিদ্ধতম পরাক্রম বিষয়ে সাক্ষ্য দিই ও তাঁর ইচ্ছা থেকে পিতার ইচ্ছাকে কখনও বিচ্ছিন্ন না করি, তাহলে ধর্মভক্তিতে অবস্থান করব। একই প্রকারে, যখন প্রভুকে পথ (ঙ) বলা হয়, তখন আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতা জনিত ধারণা থেকে উচ্চতর ধারণায় উপনীত হই; কেননা ‘পথ’ বলতে আমরা সিদ্ধতা-প্রাপ্তি অভিমুখে এমন অগ্রগতিকে বুঝি যা ন্যায় ও জ্ঞানের আলোর কর্ম সাধনে অধ্যবসায়ে ও অনুক্রম পালনে সাধিত; এ অগ্রগতিতে আমরা সামনের দিকে সবসময় অগ্রসর হয়ে যা কিছু ত্যাগ করি সেটার অতীতে ধাবিত থাকব যতক্ষণ সেই সুখময় লক্ষ্যে, সেই ঈশ্বরজ্ঞানেই না পৌঁছোই যা প্রভু নিজের “দ্বারা” তাদের দান করেন যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী। কেননা আমাদের প্রভু সত্যিই এমন মঙ্গলময় পথ যা থেকে কখনও সরে যেতে নেই; এমন পথ যা সোজা ও সত্যকার মঙ্গলের কাছে তথা পিতার কাছে চালনা করে। তিনি নিজে বলেন, *পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার “মধ্য দিয়ে” যায়* (চ)। এইভাবে ঈশ্বর অভিমুখে আমাদের এ আরোহণ পুত্রের “দ্বারাই” বা “মধ্য দিয়েই” ঘটে।

১৯। পুত্রের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পিতার মঞ্জুর করা মঙ্গলদানগুলো যে কি, তা এখনই স্পষ্ট করা দরকার। অস্তিত্বশীল হবার জন্য দৃশ্যগত সৃষ্টির ও উপলব্ধও সৃষ্টির সমস্ত প্রকৃতির জন্য ঈশ্বরের যত্নের দরকার আছে। স্রষ্টা-লোগোস-বাণী সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর এক একজনের প্রয়োজনের মাত্রা অনুসারে নিজের সহায়তা প্রদান করতে করতে তাঁর নানাবিধ সবধরনের সাহায্য বিতরণ করেন যা উপকৃতদের বিভিন্নতা হেতু প্রয়োজনের জরুরী অবস্থা অনুসারে এক একজনের জন্য উপযোগী। যারা অজ্ঞতার অন্ধকারের বন্দি, তিনি তাদের আলোকিত করেন: সেজন্য তিনি ‘সত্যকার আলো’ (ক)। তিনি কর্মের যোগ্যতা অনুসারে বিচার করেন ও মজুরি স্থির করেন: এজন্য তিনি ‘ধর্মময়

বিচারকর্তা’ [খ]। ‘*কারণ পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন*’ [গ]। যারা জীবনের উচ্চতা থেকে পাপে পিছলে পড়েছে, তাদের তিনি পতন থেকে উচ্চ করে তোলেন: সেজন্য তিনি পুনরুত্থান। মঙ্গলের অভিপ্রায়ে সক্রিয় হয়ে ও নিজের পরাক্রমের স্পর্শ দ্বারাই তিনি এসব কিছু সাধন করেন। তিনি চরান, আলো দান করেন, পুষ্টি যোগান, চালনা করেন, নিরাময় করেন, পুনরুত্থিত করেন; যা অস্তিত্বশীল নয় তা তিনি অস্তিত্বশীল করে তোলেন; যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তা জীবনময় করে রাখেন। এইভাবে সমস্ত মঙ্গলদান ঈশ্বর থেকে আমাদের কাছে সেই পুত্রের “দ্বারা” আসে যিনি সেগুলোর এক একটার জন্য এমন দ্রুততার সঙ্গে কাজ করেন যা কথা-উচ্চারণের চেয়েও দ্রুত। বিদ্যুৎ-ঝলক ও আকাশ-বাতাসের মধ্য দিয়ে আলোর দৌড়ও সেইমত দ্রুত নয়; চোখের দ্রুত পিট্‌পিট্‌ ও আমাদের চিন্তার চলনও সেইমত দ্রুত নয়। ঐশকর্মের দ্রুততার তুলনায় এসমস্ত কিছুর এক একটা জিনিস ততখানি হার মানে যতখানি সবচেয়ে মন্থর পশুরাও নিজেদের চলাচলে মন্থর হয়; আর আমি পাখি বা বাতাস বা আকাশমণ্ডলের চলাচলের কথা বলছি না, আমাদের নিজেদের চিন্তারই কথা বলছি। তবে, যিনি ‘*নিজের পরাক্রান্ত বচনে সবকিছু ধারণ করে আছেন*’ [ঘ] ও দৈহিক ভাবে সক্রিয় নন, সৃষ্টি করার জন্য নিজের হাতের সাহায্য যাঁর দরকার হয় না, কিন্তু তিনি যা কিছু করেছেন, নিজের অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা ক্রমে যিনি তা বশীভূত করে রাখেন, তাঁর পক্ষে কোন্‌ অতিরিক্ত কালের দরকার হতে পারে? এবিষয়ে যুদিথ বলেন, *তুমি পরিকল্পনা করেছিলে, ও যা নিরূপণ করেছিলে সেইসব কিছু এসে উপস্থিত হল* [ঙ]। অন্যদিকে, পাছে আমরা সৃষ্টিকর্মের মহত্ত্ব দ্বারা এমনটা ভাবতে আকর্ষিত হই যে প্রভু অনাদি, সেজন্য যিনি স্বয়ং জীবন তিনি কী বলেন? *আমি পিতারই জন্য জীবিত* [চ], এবং ঈশ্বরের পরাক্রম বলেন, *নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না* [ছ]; এবং সিদ্ধতাবিশিষ্ট প্রজ্ঞা বলেন, *আমাকে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, আমি কী বলব, কী প্রচার করব* [জ]। এসমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের পিতা-জ্ঞানে চালনা করেন, ও সৃষ্টজীবদের বিস্ময় তাঁরই দিকে আকর্ষণ করেন যেন আমরা তাঁর “দ্বারা” পিতাকে জানি। কেননা সৃষ্টিকর্মসমূহের যে পার্থক্য তাঁর বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র একটা কর্মক্রিয়াকে প্রকাশ করত, সেই পার্থক্য থেকে পিতাকে উপলব্ধি করা যায় না, যেহেতু

পুত্র পিতাকে যা কিছু করতে দেখেন তিনিও সেইমত ঠিক তাই করেন (ঝ); কিন্তু একমাত্র জনিতজন যে গৌরব পিতাকে আরোপ করেন, পিতা সেই গৌরব থেকে নিজের কর্মকাণ্ডের মহত্ত্বের জন্য আপন সৃষ্টজীবদের বিস্ময় গ্রহণ করেন ও যেহেতু তিনিই সেই সবকিছুর প্রণেতা সেজন্য তাদেরই দ্বারা গৌরবান্বিত ও উন্নীত যারা তাঁকে আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেরই পিতা বলে চিনে নেয় '*যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে থাকে*' (ঞ)। সেজন্য প্রভু বলেন, 'যা কিছু আমার, তা সমস্তই তোমার': এইভাবে তিনি কেমন যেন পিতার কাছে সৃষ্টিকর্মের সূচনা জড়িত করেন; '*এবং যা তোমার, তা আমার*' (ট): কেমন যেন ঠিক সেখান থেকেই [তথা পিতা থেকে] সৃষ্টি-কারণটা তাঁর কাছে আগত, যদিও সক্রিয় হবার জন্য তাঁর কোন সাহায্যের দরকার হয় না, ও যদিও এক একটা কর্মের জন্য তা করার বিশেষ দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া না হয়ে থাকে। কেননা এটা হত দাসদেরই স্বীয় ভূমিকা: এমন ভূমিকা যা ঐশ্বরিক যোগ্যতা থেকে বহু দূরে। কিন্তু লোগোস-বাণী পিতার মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে পিতার দীপ্তি প্রতিবিম্বিত করতে করতে তাঁরই সাদৃশ্যে সবই করেন যিনি তাঁকে জনিত করলেন। কেননা যখন তিনি সত্তা ক্ষেত্রে পৃথক নন, তখন পরাক্রম ক্ষেত্রেও পৃথক নন: যে সৃষ্টজীবদের মধ্যে কার্যক্ষমতা সমান, তাদের মধ্যে অবশ্যই কার্যও একেবারে সমান হওয়া চাই। খ্রিষ্ট হলেন 'ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা' (ঠ), 'সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল' (ড), 'সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে' (ঢ), তিনি যেন যন্ত্রপাতির বা দাসের ভূমিকা পালন করেন এজন্য নয়, কিন্তু তিনি যেন সৃষ্টিকর্তা-ভূমিকা পালন করায় পিতার ইচ্ছা পূরণ করেন।

২০। যখন তিনি বলেন, 'আমি নিজে থেকে কথা বলিনি' এবং যখন এও বলেন, '*পিতা আমাকে যেমন বলেছেন, আমি তা তেমনিই বলি*', '*যে বাণী তোমরা শুনছ, তা আমার নয়। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা তাঁরই বাণী*', *এবং যখন অন্যত্র বলেন*, '*পিতা আমাকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি সেইমত করি*' (ক), তখন তিনি যে এধরনের কথা ব্যবহার করেন কারণ নিজে স্বাধীনতা-বিহীন বা নিজস্ব ইচ্ছা-শক্তির অধিকারী নন বা পূর্বস্থিরীকৃত একটা সঙ্কেতের অপেক্ষায় আছেন, এজন্য নয়, তিনি বরং এটা প্রকাশ করেন যে, তাঁর অন্তরঙ্গ অভিপ্রায় পিতার অভিপ্রায়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে

মিলিত ও অবিচ্ছেদ্য। আমরা যা 'আজ্ঞা' বলি, তা যেন কণ্ঠযন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চারিত এমন আজ্ঞামূলক শব্দ বলে উপলব্ধি না করি যা পুত্রকে নিম্নপদস্থ ব্যক্তি হিসাবে যা করণীয় তা করতে আদেশ করে; কিন্তু শব্দটা যেন এমন একটা ইচ্ছা-হস্তান্তরের মত উপলব্ধি করি যা পিতা থেকে পুত্রের কাছে ঐশ্বরিক ভাবে, সেই অনন্তকালেই, ঘটে: তা যেন কোন একটা রূপের ছবি যা আয়নায় প্রতিবিম্বিত। *'কেননা পিতা পুত্রকে ভালবাসেন ও সমস্তই তাঁকে দেখান'* [খ]। এর ফলে, যা কিছু পিতার, তা পুত্রের অধিকার: তা যে মন্থর ও ক্রমাগত যোগ-প্রক্রিয়ার ফল এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, সমস্ত কিছু সমষ্টিগত ভাবে তাঁর কাছে বর্তমান। মানুষদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের পেশা উত্তমরূপে শিখেছে ও দৈনন্দিন চর্চার ফলে সেবিষয়ে একেবারে দক্ষ ও সুনিশ্চিত, সেই ব্যক্তি যে মূলনিয়ম শিখেছে, বিজ্ঞানের সেই মূলনিয়ম অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে নিজের কাজ চালাতে পারে; অন্যদিকে, ঈশ্বরের সেই প্রজ্ঞা তথা গোটা বিশ্বের সেই স্রষ্টা যিনি সতত সিদ্ধতাবিশিষ্ট ও শিক্ষা গ্রহণ না করেও প্রজ্ঞাবান, ঈশ্বরের সেই পরাক্রম *'যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত'* [গ], তাঁর পক্ষে কি খণ্ডে খণ্ডে এমন নির্দেশনা দরকার যা তাঁর জন্য কর্মক্রিয়ার কায়দা ও পরিমাপ স্থির করবে? তোমার অসার চিন্তা-ভাবনায় তুমি হয় তো এমন একটা বিদ্যালয়ও শুরু করে দেবে যেখানে শিক্ষকের স্থানে পিতাকে ও অজ্ঞ শিষ্যের স্থানে পুত্রকে বসাবে: এবং এইভাবে শিষ্য-পুত্র নিয়মগুলোর বৃদ্ধির ফলে আস্তে আস্তে প্রজ্ঞা শিখে নেবেন ও সিদ্ধতা-প্রাপ্তি অভিমুখে এগিয়ে চলবেন। তাই, তুমি যদি অন্তত ধারণাগুলোর ধারাবাহিকতাই বজায় রাখতে পার, তাহলে এমনটা দেখবে যে, পুত্র সতত শিখে নেন কিন্তু সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হতে পারেন না, কারণ পিতার প্রজ্ঞা সীমাহীন, ও যা কিছু সীমাহীন তার নাগাল স্পর্শ করা সম্ভব নয়। এর ফলে, যে কেউ এটা মানে না যে পুত্র আদি থেকে সবকিছুর অধিকারী, সে এটাও মানতে পারবে না যে পুত্র সিদ্ধতা-প্রাপ্তির নাগাল পাবেন। কিন্তু আমি এ ধারণা বিষয়ে লজ্জাবোধ করি, এমন ধারণা যার দিকে আলোচনার ধারাবাহিকতাই আমাকে চালনা করেছে। সুতরাং এসো, বিষয়বস্তুর উচ্চতর দিকের দিকে পুনরায় ফিরে যাই।

২১। *'যে আমাকে দেখে, সে পিতাকে দেখে'* [ক]: সে তাঁর চেহারাও দেখে না, তাঁর রূপও দেখে না, কেননা ঐশ্বরিক স্বরূপ সংমিশ্রণ-মুক্ত, কিন্তু সে সেই ইচ্ছার মঙ্গলময়তা

দেখবে যা সত্তার সংগামী হওয়ায় পিতা ও পুত্রতে সদৃশ ও সমান ব'লে এমনকি একই ব'লে পরিগণিত। সুতরাং, [পুত্র] 'নিজেকে বাধ্য করায়' ও [পিতা] 'আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন' (খ) উক্তি দু'টোর অর্থ কি? অর্থ এটা যে, পিতা থেকে পুত্রের কাছে সেই কর্মক্রিয়া আগত যা গুণে পুত্র পিতার প্রতি মঙ্গলময়তার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করেন। কিন্তু তুমি এ বাণী দু'টো শোন, '*খ্রিষ্ট মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন*' (গ) ও '*আমরা যখন পাপী ছিলাম তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন*' (ঘ)। প্রভুর বাণীতেও ভাল মত মনোযোগ দাও: পিতা বিষয়ে আমাদের উপদেশ দেওয়ার পর তিনি একেবারে অধিকারসম্পন্ন বাণী ব্যবহার করেন, '*আমি ইচ্ছা করি, শুচীকৃত হও*' (ঙ), আরও, '*শান্ত হও, স্থির থাক*' (চ), আরও, '*আমি তোমাদের বলছি*' (ছ), আরও, '*হে বধির বোবা আত্মা, আমিই তোমাকে আদেশ করছি*' (জ), ও বাকি সমস্ত অনুরূপ বাণী ব্যবহার করেন যাতে এ বাণীগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের প্রভু ও স্রষ্টাকে চিনে নিই ও বাকি অন্যান্য বাণীগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা যেন আমাদের প্রভু ও স্রষ্টার পিতাকে জানতে শিখতে পরি। এইভাবে তিনি সব দিক দিয়ে সত্যকার ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন, তথা, পিতা যে পুত্রের "দ্বারা" সৃষ্টি করেন, এ থেকে যেন অনুমান করা না হয় যে পিতার সৃষ্টি-ক্ষমতা অসিদ্ধ, পুত্রের কর্মক্রিয়াও যেন দুর্বল বলে প্রকাশিত না হয় বরং এসমস্ত দ্বারা যেন ইচ্ছার ঐক্যই উপস্থাপিত হয়। অতএব, "যাঁর দ্বারা" সূত্রটা কার্যকর কারণের প্রতি আপত্তি ব্যক্ত না ক'রে প্রধান কারণ স্বীকার করে।

৯ম অধ্যায়। শাস্ত্রের শিক্ষা অনুযায়ী পবিত্র আত্মা সম্পর্কে সঠিক ধারণা।

২২। এবার এসো, পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ ধারণা যে কি, তা অনুসন্ধান করি: সেই ধারণাসমূহও অনুসন্ধান করি যা আমাদের জন্য শাস্ত্র থেকে সংগ্রহ করা, ও সেই ধারণাসমূহও অনুসন্ধান করি যা আমরা পিতৃগণের অলিখিত এমন পরম্পরাগত শিক্ষা থেকে গ্রহণ করেছি। প্রথম কথা: [পবিত্র] আত্মার নামগুলো শুনে কে প্রাণে নিজেকে উত্তোলিত করে না ও সেই পরম স্বরূপের প্রতি নিজের চিন্তা উন্নীত করে না? তাঁকে বলে 'ঈশ্বরের আত্মা' (ক), 'সেই সত্যের আত্মা যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন' (খ), 'ধর্মময় আত্মা' (গ), 'প্রধান আত্মা' (ঘ)। 'পবিত্র আত্মা' হলো তাঁর

প্রকৃত ও বিশিষ্ট আখ্যা: অন্য যত নামের চেয়ে এ নামটাই অধিক সূক্ষ্মভাবে তাঁর সমস্ত অশরীরী, সম্পূর্ণরূপে অবস্তুগত ও সরল সত্তা ব্যক্ত করে। সেজন্য যে স্ত্রীলোক মনে করছিল ঈশ্বরকে এক স্থানে উপাসনা করা দরকার, যা অশরীরী তা যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয় তাকে এমনটা শেখাতে গিয়ে প্রভুও বলেন, *‘ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ’* (ঙ)। তাই এমনটা হতে পারে না যে, যে ব্যক্তি আত্মাকে শোনে সে গন্ডিবদ্ধ একটা স্বরূপ কল্পনা করবে যা পরিবর্তন ও বিকৃতি সাপেক্ষ বা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টবস্তুর অনুরূপ। সেই ব্যক্তি বরং যা ঊর্ধ্বতম, ও চিন্তা-ভাবনায় সেই দিকেই নিজেকে নিক্ষেপ ক'রে এমন স্বরূপের কথা ভাবুক যা বুদ্ধিসম্পন্ন, অপরিসীম পরাক্রম ও অসীম মহত্ত্বের অধিকারী, কাল ও যুগ ক্ষেত্রে অপরিমেয়, ও নিজস্ব মঙ্গলদানের উপকর্তা। যা কিছু পবিত্রীকরণের দরকার আছে, তা সেই পরম স্বরূপের দিকেই চেয়ে দেখে; যারা পুণ্যতা অনুযায়ী জীবন যাপন করে তারা সকলে সেটাকেই একাগ্রতার সঙ্গে বাসনা করে, কেননা সেই পরম স্বরূপের ফুৎকার থেকে তারা কেমন যেন তেজময়ী হয়ে ওঠে ও নিজ প্রকৃতির অনুসারেও তাদের নিজস্ব লক্ষ্যের নাগাল পাবার জন্য সহায়তা পায়। সেই পরম স্বরূপ অন্যকে সিদ্ধতামন্ডিত করতে সক্ষম কিন্তু তবু নিজেতে কোন কিছুতেই অভাবী নন; তিনি জীবনময় যদিও নিজের শক্তিকে পুনর্জাগরিত করা তাঁর পক্ষে কোন প্রয়োজন নেই, এমনকি তিনি জীবন পুনঃ পুনঃ দান করেন; তিনি ক্রমগত বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধিশীল নন, কিন্তু নিজেই অবিরত পূর্ণতা; তিনি নিজেতে স্থায়ী ও সেইসঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি [তথা সেই পরম স্বরূপ] পবিত্রতার উৎস, উপলব্ধ আলো; সত্য-অনুসন্ধানের জন্য তিনি চেতনা-বিশিষ্ট যেকোন শক্তির কাছে নিজের মধ্য থেকে এক প্রকার আলো অর্পণ করেন। স্বরূপে তিনি অগম্য, তাঁকে তাঁর মঙ্গলময়তার জন্যই উপলব্ধি করা যায়, তিনি সমস্ত কিছু নিজের পরাক্রমে পরিপূর্ণ করেন (চ), কিন্তু যে যোগ্য, কেবল তাকেই নিজের সহভাগী করেন, এতে তিনি একক পরিমাপ অবলম্বন করেন না কিন্তু বিশ্বাসের অনুপাত অনুসারে নিজের কর্মক্রিয়া বিতরণ করেন। সত্তায় তিনি একগুণ-সম্পন্ন, বিস্ময়কর কর্মে বৈচিত্র্যময়, এক একজনের কাছে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান, আবার সর্বত্রও সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তিনি নিজেকে বিভক্ত করেন কিন্তু যন্ত্রণাবিহীন হয়ে থাকেন; নিজের অক্ষুণ্নতা বজায় রেখে নিজেকে প্রদান করেন; তিনি

সূর্যের এমন রশ্মির মত যার উপকার যে ভোগ করে সে একাই যেন ভোগ করে, কিন্তু সেই রশ্মি সেইসঙ্গে পৃথিবী ও সাগরও আলোকিত করে ও আকাশ-বাতাসের সঙ্গেও নিজেকে মিশ্রিত করে। তেমনি [পবিত্র] আত্মা: যে কেউ তাঁকে গ্রহণ করতে সক্ষম, তিনি তার কাছে বিদ্যমান, সেই ব্যক্তি যেন একাই তাঁর গ্রহীতা; তিনি সকলের জন্য পর্যাপ্ত ভাবে নিজের অনুগ্রহ পূর্ণমাত্রায় নিঃসৃত করেন: তাতে তারাই আনন্দিত যারা তাঁর ক্ষমতা অনুসারে নয় কিন্তু নিজ নিজ স্বরূপের ক্ষমতা অনুসারে তাতে সহভাগী হয়।

২৩। প্রাণের সঙ্গে [পবিত্র] আত্মার আন্তরিক সংসর্গ স্থানে অগ্রগতির ব্যাপার নয়, কেননা যা অশরীরী, মানুষ কেমন করে শারীরিক ভাবে তার দিকে অগ্রসর হতে পারে? সেই সংসর্গ বরং ইন্দ্রিয়-আবেগ প্রত্যাহারে স্থিত, সেই যে আবেগসমূহ মাংসের আকর্ষণের দ্বারা প্রাণকে আক্রমণ করার পর অবশেষে প্রাণকে ঈশ্বরের সঙ্গে তার সেই সংসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তাই সেই সহায়কের কাছে এগিয়ে যাবার জন্য একমাত্র উপায় এটাই হলো: কুৎসিত যা কিছু পাপের দরুন এক পিণ্ডই যেন হয়েছে, তা থেকে প্রাথমিক সৌন্দর্যে ফিরে যাওয়া ও, বলতে গেলে, শুদ্ধতা দ্বারা রাজকীয় প্রতিমূর্তিকে প্রাচীন রূপ ফিরিয়ে দেওয়া। সূর্যের মত হয়ে তিনি শুদ্ধীকৃত চোখ চিনে নিয়ে তোমার কাছে নিজেতেই সেই অদৃশ্যজনের প্রতিমূর্তি দেখাবেন। প্রতিমূর্তিকে সুখময় দর্শনে তুমি সেই আদিরূপের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দেখতে পাবে। তাঁর দ্বারা মন উন্নীত হয়, দুর্বল যারা তাদের হাত ধরে চালনা করা হয়, অগ্রসর যারা তারা সিদ্ধতাপ্রাপ্ত হয়। যারা সমস্ত মলিনতা থেকে নিজেদের শুদ্ধীকৃত করেছে তাদের আলোকিত ক'রে তিনি নিজের সঙ্গে তাদের সহভাগিতা গুণে তাদের আত্মিক করে তোলেন, এবং উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দেহগুলোর উপর রশ্মি পড়লে সেই দেহগুলোও যেমন দীপ্তিময় হয়ে ওঠে ও নিজ নিজ থেকে অন্য বিভা প্রতিবিম্বিত করে, তেমনি [পবিত্র] আত্মা-বহনকারী প্রাণ সেই আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে আত্মিক হয়ে ওঠে ও অন্যান্য প্রাণের উপর অনুগ্রহ ঢেলে দেয়। এ থেকেই হয় ভাবী ঘটনা পূর্বদৃষ্টি, রহস্যাদি জ্ঞান, গুপ্ত বিষয়াদি উপলব্ধি, অনুগ্রহদানগুলো বিতরণ, স্বর্গীয় নাগরিকত্ব লাভ, অনন্ত আনন্দ, ঈশ্বরে অবস্থান, ঈশ্বরের সঙ্গে সাদৃশ্য, ও সেই সর্বোচ্চ বাসনা তথা ঈশ্বর হওয়া। সুতরাং, এগুলোই হলো পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গে আমাদের ধারণা যা তাঁর মহত্ত্ব, যোগ্যতা ও কর্মক্রিয়া ক্ষেত্রে আমরা আত্মার

খোদ বচনাদি থেকে উপলব্ধি করতে শিখেছি—যদিও বহু বহু ধারণার মধ্য থেকে আমরা মুষ্টিমেয় ক'টা মাত্র উল্লেখ করেছি। কিন্তু এখন আমাদের পক্ষে যা করা দরকার তা হলো প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্মুখীন হওয়া ও তাদের সেই সমস্ত প্রতিবাদ খণ্ডন করতে চেষ্টা করা যা '*মিথ্যায় জ্ঞান বলে অভিহিত জ্ঞানের*' [ক] ভিত্তিতে আমাদের ধারণাসমূহের বিপরীত ধারণা।

১০ম অধ্যায়। পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্রের "সহঅনুক্রমিত" করতে নেই, যারা তেমন ধারণা সমর্থন করে তাদের প্রতি আমাদের প্রতিবাদ।

২৪। তারা নাকি বলে, স্বরূপের পার্থক্যের কারণে ও নিম্ন যোগ্যতার কারণে পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্রের "সহঅনুক্রমিত" করতে নেই। এদের কাছে প্রেরিতদূতদের কথায় প্রতিবাদ করা ন্যায্য, তথা, 'মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত' [ক]। আমাদের হাতে পরিত্রাণের বাপ্তিস্ম ন্যস্ত করায় যখন প্রভু পবিত্র আত্মার সঙ্গে সহভাগিতা উপেক্ষা না করে শিষ্যদের সকল জাতিকে '*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে*' [খ] বাপ্তিস্ম দিতে আজ্ঞা করেছেন, ও এরা যখন অপরদিকে এমনটা বলে যে তাঁকে পিতা ও পুত্রের "সহঅনুক্রমিত" করতে নেই, তখন কেমন করে বলা যেতে পারে, তারা প্রকাশ্যে ঈশ্বরের আদেশের বিরোধিতা করছে না? এবং তাদের কথামত, যদি সেই "সহঅনুক্রমিত" করাটার অর্থ সহভাগিতা ও 'স্বরূপের' ঐক্য না হয়, তাহলে নিজেরাই বলুক কীবা তেমনটা বিশ্বাস করতে অধিকার দেয়, ও সেই সংযোগ ব্যক্ত করার জন্য আরও উপযোগী উপায় বলতে তাদের কী আছে। যাই হোক, যদি প্রভু বাপ্তিস্মে আত্মা, পিতা, ও নিজের মধ্যে কোন সংযোগ স্থির করে না থাকেন, তাহলে তাঁদের সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আমাদের নিন্দা না করুক, কারণ [যা লেখা রয়েছে তা থেকে] আমরা ভিন্ন কিছুই ভাবিও না, ব্যক্তও করি না। কিন্তু যখন বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত সূত্রে আত্মা পিতা ও পুত্রের সঙ্গে মিলিত, এবং এর বিপরীত কথা বলার মত দুঃসাহসী একজনও নেই, তখন, যা লেখা রয়েছে আমরা যখন তা পালন করি, তখন তারা যেন এবিষয়ে আমাদের নিন্দা না করে।

২৫। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চলছে: যত চিন্তা-ভাবনা আমাদের বিরুদ্ধে লক্ষ করে ও সেই ঈশ্বরনিন্দুকদের জিহ্বা তীরের মত নিক্ষিপ্ত হয়ে তত তীব্রতর ভাবে আঘাত করছে, সেই খ্রিষ্টঘাতকেরা পাথর দিয়ে স্তেফানকে যত আঘাত করছিল। কিন্তু আমরা যে সেই যুদ্ধের অজুহাত মাত্র, তা তারা লুকোতে চেষ্টা না করুক; কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা আরও উচ্চতেই লক্ষ করছে। দেখা যাচ্ছে, অস্ত্রপাতি ও ফাঁদ আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করা হচ্ছে ও এক একজনের অভিজ্ঞতা ও শক্তি অনুসারে তারা সাহায্যের জন্য নিজেদের উৎসাহিত করছে। কিন্তু যা আক্রমণ করা হচ্ছে তা হলো বিশ্বাস, ও ধর্মময় ধর্মতত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ও শত্রুদের মিলিত লক্ষ্য হলো প্রৈরিতিক পরম্পরাগত শিক্ষা বাতিল ক'রে ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে খ্রিষ্টে বিশ্বাসের ভিতে ঝাঁকা দেওয়া। এজন্য বিশ্বাসযোগ্য ঋণীরা যেমন করতে ইচ্ছা করে, তেমনি তারা পিতৃগণের অলিখিত সেই সাক্ষ্য অনির্ভরযোগ্য বলে অস্বীকার করতে করতে শাস্ত্রের প্রমাণ আহ্বান করে। কিন্তু আমরা সত্যকে ত্যাগ করব না, ভয়ে অভিভূত হয়ে সেটার সঙ্গে আমাদের সন্ধির প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করব না। কেননা যখন প্রভু পিতার সঙ্গে পবিত্র আত্মার সহঅনুক্রমকে আবশ্যকীয় ও পরিত্রাণদায়ী তত্ত্ব বলে আমাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে তা সেরকম নয় বরং এমনটা মনে করে, তাঁকে পিতা থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দাসের স্বরূপে নিম্নপদস্থ করা দরকার, তখন এটা কি সত্য নয় যে প্রভুর আদেশের চেয়ে তারা নিজেদের ঈশ্বরনিন্দাকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে? কিন্তু যত বিবাদ বর্জন করে এসো, আমাদের হাতে যা রয়েছে, সবাই মিলে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করি।

২৬। আমরা কোন্ কারণে খ্রিষ্টিয়ান? এক একজন বলতে পারত, 'বিশ্বাসের জন্য'। কেমন করে পরিত্রাণ পেয়েছি? ঊর্ধ্ব থেকে নবজন্ম লাভ ক'রে, অবশ্যই, বাপ্তিস্মে দেওয়া তাঁর অনুগ্রহ গুণে। কেননা অন্যথা আমরা কেমন করে পরিত্রাণ পেতে পারতাম? তবে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা দ্বারা নিশ্চিত করে দেওয়া এই পরিত্রাণ জানার পর আমরা যে ধর্মশিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম (ক), তা কি একেবারে উড়িয়ে দেব? আমরা সেসময় যা গ্রহণ করে নিয়েছিলাম, তা যদি এখন অস্বীকার করি, তাহলে, যে সময়ে আমরা বিশ্বাসে এসেছিলাম, তখনকার চেয়ে যদি এখন আমরা আমাদের

পরিত্রাণ থেকে বেশি দূরে অবস্থান করতাম, তবে এটা সত্যিই চোখের জল ফেলার কারণ হত। বাপ্তিস্ম ছাড়া প্রস্থানেও (খ) সেই একই ক্ষতি রয়েছে, যে ক্ষতি এমন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করাতেও রয়েছে যা [মণ্ডলীর] পরম্পরাগত (গ) একটা উপাদানের অভাবী বাপ্তিস্ম। এবং যে বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি আমরা [মণ্ডলীতে] আমাদের প্রথম প্রবেশে তখনই গচ্ছিত রেখেছিলাম (ঘ) যখন প্রতিমা থেকে সরে গিয়ে জীবনময় ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে এসেছিলাম, যে কেউ সেই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি সবসময় রক্ষা করে না ও সারা জীবন ধরে তা নিশ্চিত রক্ষা হিসাবে আঁকড়ে ধরে না, সে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ক্ষেত্রে নিজেকে পরকীয় করে (ঙ) কারণ নিজের হাতে যা লিখেছিল ও নিজের বিশ্বাস-স্বীকৃতি হিসাবে যা গচ্ছিত রেখেছিল তার বিরুদ্ধে আচরণ করে। কেননা যখন আমার জন্য বাপ্তিস্ম হলো জীবনের সূচনা ও যখন দিনগুলোর প্রথম দিন হলো পুনরুত্থানের দিন, তখন এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে যত কথার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান কথা সেটাই হলো যা সেই ক্ষণে উচ্চারিত যে ক্ষণে দত্তকপুত্রত্ব-দান আমাকে মঞ্জুর করা হয়েছে। তাই এদের বাইরে-উজ্জ্বল যুক্তি (চ) দ্বারা ভোলানো হয়ে আমি কি, যে পরম্পরাগত শিক্ষা আমাকে আলোতে প্রবেশ করিয়েছে ও ঈশ্বরজ্ঞান আমাকে দিয়েছে, এবং আমি যে পাপের কারণে সেই ক্ষণ পর্যন্ত [ঈশ্বরের] শত্রু ছিলাম, যে পরম্পরাগত শিক্ষার জন্য আমি ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি, সেই পরম্পরাগত শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব? এমনকি, প্রার্থনায় আমি নিজের জন্য যাচনা করি যেন এ স্বীকারোক্তি সঙ্গে করে প্রভু অভিমুখে প্রস্থান করি, ও তাদের সনির্বন্ধ মিনতি জানাই যেন তারা বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে ও গৌরবারোপণে বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা সুরক্ষিত রেখে (ছ) পিতা ও পুত্র থেকে অবিচ্ছিন্ন [পবিত্র] আত্মাকে রক্ষা ও পালন করে (জ)।

১১শ অধ্যায়। পবিত্র আত্মাকে যে অস্বীকার করে, সে অপরাধ করে।

২৭। কারা হায় হায় করে? কারা হাহাকার করে? কারা সঙ্কোচ ও অন্ধতায় আক্রান্ত? কারা অনন্ত শাস্তি ভোগ করবে? (ক)। অপরাধী যারা, তারা নয় কি? যারা বিশ্বাস অস্বীকার করেছে, তারা নয় কি? কিন্তু তাদের অস্বীকারের প্রমাণ কি? এটা কি নয় যে তারা নিজেদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে? তারা কি ও কখন স্বীকার

করেছিল? দিয়াবলকে ও তার দূতদের প্রত্যাখ্যান করার পর যখন তারা সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী উচ্চারণ করেছিল, তখনই তারা স্বীকার করেছিল, তারা পিতায়, পুত্রতে ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করছিল [খ]। তাদের জন্য মানায় এমন কোন্ নাম আলোর সন্তানদের দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল? যারা নিজেদের পরিত্রাণের চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা রাখেনি, তাদের মত তাদেরও নাম কি 'অপরাধী' নয়? তবে ঈশ্বরকে যে অস্বীকার করে তার বিষয়ে আমাকে কী বলতে হবে? খ্রিষ্টকে যে অস্বীকার করে, তার বিষয়ে আমাকে কী বলতে হবে? 'অপরাধী' বাদে অন্য নাম আছে কি? এবং [পবিত্র] আত্মাকে যে অস্বীকার করে, তোমার মতে আমি তার জন্য কী নাম রাখব? সেটা কি সেই একই নাম নয় যা তারই মানায় যে ঈশ্বরের সঙ্গে নেওয়া অঙ্গীকার অস্বীকার করে? সুতরাং, যেহেতু ঈশ্বরে বিশ্বাস-স্বীকৃতি ধর্মভক্তির সুখ এনে দেয় ও তাঁকে প্রত্যাখ্যান আমাদের নাস্তিকতা-দণ্ডের সম্মুখীন করে, সেজন্য, যারা আগুন বা খড়্গ বা ক্রুশ বা কশা বা চক্র বা নির্যাতন-যন্ত্রগুলো দ্বারাও ভীত নয় কিন্তু [পবিত্র] আত্মার শত্রুদের [গ] চিক্কণ বুদ্ধি ও ফন্দি-ফিকির দ্বারাই মাত্র ভোলানো, তাদের দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে না? যে কেউ খ্রিষ্টকে স্বীকার করে ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, আমি তার কাছে ঘোষণা করি যে, তাতে তার কোন উপকার হবে না; অথবা, যে ঈশ্বরকে ডাকে কিন্তু পুত্রকে অস্বীকার করে, তাকে আমি বলি, তার বিশ্বাস অসার; যে পবিত্র আত্মাকে অস্বীকার করে, তাকে আমি বলি, পিতাতে ও পুত্রতে তাঁর বিশ্বাস শূন্যে পতিত হবে, কেননা [পবিত্র] আত্মা উপস্থিত না থাকলে তার বিশ্বাসও থাকতে পারে না। কেননা যে কেউ [পবিত্র] আত্মায় বিশ্বাস করে না, সেই পুত্রতে বিশ্বাস করে না, এবং যে কেউ পুত্রতে বিশ্বাস করেনি, সে পিতাতেও বিশ্বাস করে না। পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না 'যিশু প্রভু' [ঘ]। আরও, 'ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন' [ঙ]। তেমন ব্যক্তি সত্যকার উপাসনার সহভাগীও নয়, কেননা পবিত্র আত্মায় ছাড়া পুত্রকে উপাসনা করা সম্ভব নয়, দত্তকপুত্রত্বের আত্মায় ছাড়া পিতাকে ডাকাও সম্ভব নয় [চ]।

১২শ অধ্যায়। যারা বলে, কেবল প্রভুতে বাপ্তিস্মই যথেষ্ট, তাদের বিপক্ষে।

২৮। কেউই যেন সেই প্রেরিতদূতের বাণী ভুল না বোঝে যিনি বাপ্তিস্মের কথা উল্লেখ ক'রে প্রায়ই পিতা ও পবিত্র আত্মার নাম বাতিল করেন, এবং সে এই ভিত্তিতে এমনটা মনে না করুক যে নাম তিনটে করা গৌণ ব্যাপার। তিনি বলেন, *তোমরা, যাদের খ্রিস্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিস্টকেই পরিধান করেছ* (ক); আরও, *তোমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ* (খ)। কেননা খ্রিষ্টকে উল্লেখ করা হলো পূর্ণ বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করার শামিল: অর্থাৎ খ্রিষ্টকে উল্লেখ করাটা সেই ঈশ্বরকে প্রকাশ করে যিনি তৈলাভিষিক্ত করেন, সেই পুত্রকে প্রকাশ করে যিনি খ্রিষ্ট [অর্থাৎ তৈলাভিষিক্ত হন], ও সেই খ্রিস্মা [অর্থাৎ সেই তৈলাভিষেক] তথা [পবিত্র] আত্মাকে প্রকাশ করে, সেইভাবে যেভাবে পিতর প্রেরিতদের কার্যবিবরণিতে আমাদের শিখিয়ে দেন, '*ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন*' (গ), এবং ইশাইয়াতে লেখা আছে, '*প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন*' (ঘ), এবং সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *এজন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমাকে আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন* (ঙ)। তথাপি, সময় সময় এমনটা মনে হয়, বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে প্রেরিতদূত কেবল পবিত্র আত্মার কথা স্মরণ করেছেন; তিনি বলেন, *আমাদের সকলেরই একদেহে, এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে* (চ); একই ধারায় লেখা আছে, '*পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে*' (ছ), এবং '*তিনি পবিত্র আত্মায় তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন*' (জ)। কিন্তু এ ভিত্তিতে এমনটা বলা যেতে পারে না যে, যে বাপ্তিস্মে কেবল [পবিত্র] আত্মার নাম করা হবে সেই বাপ্তিস্ম সিদ্ধ। কেননা এটা প্রয়োজন যে, জীবনদায়ী অনুগ্রহে দেওয়া পরম্পরা সতত অলঙ্ঘ্য হয়ে থাকবে। যিনি আমাদের জীবনকে অবক্ষয় থেকে মুক্ত করেছেন (ঝ), তিনি নবীকরণের এমন শক্তি আমাদের দিয়েছেন যার কারণ অনির্বচনীয় ও রহস্যে আবৃত, কিন্তু যা প্রাণকে পরিত্রাণ এনে দেয়। তাই, কিছুটা যোগ করা বা বাতিল করা এমন ব্যাপার যা স্পষ্টভাবেই অনন্ত জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার শামিল। সুতরাং, বাপ্তিস্মে যখন পিতা ও পুত্র থেকে [পবিত্র] আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা বাপ্তিস্মদাতার পক্ষে ঝুঁকির ব্যাপার ও বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীর পক্ষে অনর্থক ব্যাপার, তখন

পিতা ও পুত্র থেকে [পবিত্র] আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা আমাদের পক্ষে কেমন নিরাপদ ব্যাপার হতে পারে? বিশ্বাস ও বাপ্তিস্ম হলো পরিত্রাণের এমন দু'টো বিষয় যা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য। কেননা বিশ্বাস বাপ্তিস্মে সিদ্ধতা লাভ করে, বাপ্তিস্ম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, এবং দু'টো [তথা বিশ্বাস ও বাপ্তিস্ম] একই নাম তিনটে দ্বারা সিদ্ধ পূর্ণতা লাভ করে। কেননা আমরা যেমন পিতাতে ও পুত্রতে ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, তেমনি পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দিই। আগে আসে সেই স্বীকারোক্তি যা পরিত্রাণের দিকে চালনা করে, পর পরে আসে বাপ্তিস্ম যা আমাদের সম্মতিকে সীলমোহর-যুক্ত করে।

১৩শ অধ্যায়। কেন পল পিতা ও পুত্রের সঙ্গে দূতদের যোগ করেন?

২৯। তারা নাকি বলে, অথচ পিতা ও পুত্রের "সহঅনুক্রমিত" অন্যান্য জীবও সেই সহঅনুক্রমের জোরে তাঁদের সঙ্গে গৌরবান্বিত নন। এক্ষেত্রে প্রেরিতদূত তিমথির কাছে নিজের সাক্ষ্যদানে তখনই দূতদের কথা যোগ করেন যখন বলেন, *ঈশ্বরের, খ্রিষ্ট যিশুর ও তাঁর মনোনীত দূতদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি* (ক); কিন্তু আমরা এই দূতদের সৃষ্টিকর্মের বাকি সবকিছু থেকে পৃথকও করি না, পিতা ও পুত্রের সঙ্গে মিলিতভাবে "সহঅনুক্রমিত" করতেও সহ্য করি না। আমার দিক দিয়ে, যদিও একথা যে অদ্ভুত তা এতই স্পষ্ট যে কথাটা কোন উত্তরের যোগ্য নয়, তবু এটুকু বলব যে, কোমল ও দয়াবান এক বিচারকের সামনে সাক্ষী হিসাবে এমন একজনকে আনা যেতে পারে যে বন্দিদশার সঙ্গী; বিশেষভাবে তখনই যখন বিচারক নিজের নম্রতায় অভিযুক্তদের প্রতি নিজের রায়ের অনিন্দ্য ন্যায্যতা প্রকাশ করেন। কিন্তু একজন যে দাস অবস্থা থেকে মুক্ত হবে ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবে ও মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবিত হবে, এমনটা কোনও ব্যক্তি দ্বারা লভ্য নয় যদি না সেই ব্যক্তি [ঈশ্বরের সঙ্গে] প্রকৃত আত্মীয়তার অধিকারী হয় ও দাস-অবস্থা ক্ষেত্রে অপর। কেননা, ঈশ্বরের প্রতি যে অপর, সে কেমন করে ঈশ্বরের সংযোগে [মানুষকে] আনতে পারবে? সে নিজেও যখন দাসত্ব-জোয়ালের অধীন, সে কেমন করে [পরকে] মুক্ত করতে পারবে? তাই [পবিত্র] আত্মা ও দূতেরা সদৃশ অবস্থায় উল্লিখিত নন, কেননা [পবিত্র] আত্মা জীবনের প্রভু বলে স্বীকৃত,

কিন্তু দূতেরা দাসত্বে নিজেদের সঙ্গীদের রক্ষাকর্তা ও সত্যের বিশ্বস্ত সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপিত। এটাই গতানুগতিক যে, পবিত্রজনেরা ঈশ্বরের আদেশগুলো সাক্ষীদের সম্মুখে উপস্থাপন করবেন। উদাহরণ স্বরূপ, স্বয়ং পল তিমথিকে বলেন, *অনেক সাক্ষীর মুখ দিয়ে যে সকল কথা আমার কাছ থেকে শুনেছ, তা বিশ্বস্ত লোকদের কাছে সম্প্রদান কর* [খ]। তবে, তিনি দূতদেরও সাক্ষী হিসাবে ডাকেন, কেননা তিনি জানেন, যখন তিনি [অর্থাৎ প্রভু] ন্যায্যতায় পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে বিচার করার জন্য পিতার গৌরবে আসবেন, তখন দূতেরাই বিচারকর্তার সহায়ক হবেন; তিনি বলেন, *যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করবে, মানবপুত্রও ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করবেন; কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার করবে, ঈশ্বরের দূতদের সামনে তাকে অস্বীকার করা হবে* [গ]। অন্য এক পদে পল বলেন, *প্রভু যিশু তাঁর দূতবাহিনীর সঙ্গে স্বর্গ থেকে আবির্ভূত হবেন* [ঘ]। তিনি এজন্যই এখানেও দূতদের সামনে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, যাতে মহৎ আদালতের জন্য যথার্থ প্রমাণ যোগাড় করতে পারেন।

৩০। এবং এতে পল তো একা নন, কিন্তু যাঁদের কাছে বাণী সংক্রান্ত কোন সেবাকর্ম ন্যস্ত করা হয়েছে, সাধারণত তাঁরা সবাই সেই সেবাকর্ম ঘোষণা করায় কখনও ক্ষান্ত হন না, এমনকি [সাক্ষীরূপে] আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকেও ডাকেন; কেননা এখন প্রতিটি কর্ম তাঁদের বুকে সম্পাদিত, ও জীবনকালে সম্পাদিত কর্ম বিচার-ক্ষণে তাঁরা বিচারাধীনদের পাশে দাঁড়াবেন। [সামসঙ্গীত-রচয়িতা] বলেন, *ঊর্ধ্বলোক থেকে তিনি আকাশমণ্ডলকে ডাকবেন, পৃথিবীকেও ডাকবেন তাঁর আপন জাতির বিচারের জন্য* [ক]। এজন্য যখন মোশি জনগণের কাছে আজ্ঞাগুলো প্রদান করতে উদ্যত হন তখন ঘোষণা করেন, *আমি আজ সাক্ষী হিসাবে তোমাদের কাছে আকাশমণ্ডলকে ও পৃথিবীকে ডাকছি* [খ]। এবং সেই গীতিকা উচ্চারণ কালে তিনি বলেন, *কান দাও, আকাশমণ্ডল, আর আমি কথা বলব; শোন, পৃথিবী, আমার মুখের কথা* [গ]। এবং ইশাইয়া বলেন, *শোন, আকাশমণ্ডল; কান দাও, পৃথিবী* [ঘ]; এবং যেরেমিয়া এমনটা বলেন, জনগণের অভক্তির কথা শুনে আকাশমণ্ডল এক প্রকারে স্তম্ভিত, '*আকাশমণ্ডল এতে স্তম্ভিত হলো ও দীর্ঘকাল ধরে নিতান্ত অভিভূত হলো, কারণ আমার আপন জনগণ এই অপরাধ দু'টো*

করেছে’ [ঙ]। যিনি এটা জানেন যে, মানুষদের জন্য দূতেরা পরিচালক দাস ও গৃহ-শিক্ষক বলে নিযুক্ত, সেই প্রেরিতদূতও তাঁদের সাক্ষী হিসাবে ডেকেছিলেন। এবং নাবের সন্তান যিশু [অর্থাৎ নূনের সন্তান যোশুয়া] [ঈশ্বরের] বাণীর সাক্ষ্য হিসাবে একটা পাথর উত্তোলন করেছিলেন [চ], কিন্তু আরও আগে যাকোব দ্বারা একটা উপপর্বতকেও সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়েছিল [ছ]। তিনি বলেন, *দেখ, তোমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে যতবার মিথ্যা বলবে, এই পাথরটা আজ থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে* [জ]; এমনটা হতে পারে, তিনি বিশ্বাস করছিলেন, ঈশ্বরের প্রতাপে পাথরও অপরাধীদের তিরস্কার করার জন্য কণ্ঠ শোনাতে পারত; বা এমনটা না হলে তবে তিনি এটা বিশ্বাস করছিলেন যে অন্তত এক একজনের বিবেক সেই স্মৃতির প্রভাবে আঘাতগ্রস্ত হবে। এইভাবে, প্রাণদের যত্ন যাঁদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, তাঁরা নিজেদের জন্য নানা সাক্ষী প্রস্তুত করেন, সেই সাক্ষী যেই হোক না কেন, যাতে ভাবীকালে তাদের দাঁড় করাতে পারেন। কিন্তু [পবিত্র] আত্মা সাময়িক প্রয়োজনের জন্য নয় কিন্তু স্বরূপগত সহভাগিতা গুণেই ঈশ্বরের “সহঅনুক্রমিত”, তিনি আমাদের দ্বারা জোর প্রয়োগে টানা নন, কিন্তু প্রভুর সঙ্গে মিলিত।

১৪শ অধ্যায়। **আপত্তি: তারাও কারও কারও মোশির উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে ও তারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখল। আপত্তিতে প্রতিবাদ। ‘পূর্বচিহ্ন’ বিষয়ও আলোচিত।**

৩১। তারা নাকি বলে, যদিও আমাদের পবিত্র আত্মার উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়নি, তবু এক্ষেত্রেও এটা ন্যায্য নয় যে তাঁকে ঈশ্বরের সঙ্গে একই অনুক্রমে রাখা হবে। কেননা, ‘মোশির উদ্দেশেও মেঘে ও সমুদ্রে কারও কারও বাপ্তিস্ম হয়েছিল’ [ক]। একই প্রকারে এটাও মেনে নেওয়া হচ্ছে যে মানুষ আগেও বিশ্বাসের অধিকারী হয়েছিল: ‘জনগণ প্রভুতে ও তাঁর দাস মোশিতে বিশ্বাস রাখল’ [খ]। তারা আরও বলে, তবে কেনই বা বিশ্বাস ও বাপ্তিস্মের ফলে পবিত্র আত্মাকে সৃষ্টির উপরে ততখানি উত্তোলিত ও মহিমান্বিত করা দরকার আছে যখন মানুষদের বেলায়ও একই বিষয় প্রমাণিত? তাই আমরা কী বলব? এটাই বলব যে, [পবিত্র] আত্মায় বিশ্বাস হলো পিতাতে ও পুত্রতে

বিশ্বাসের মত, এবং বাপ্তিস্মও সেইরূপ। মোশি ও মেঘের উদ্দেশে বিশ্বাস এমন যা ছায়ায় ও পূর্বচিহ্নে বিশ্বাস। কিন্তু, যেহেতু ঐশ্বরিক বিষয়গুলো নিম্ন ধরনের ও মানবীয় বিষয় দ্বারা পূর্বনির্দেশিত, সেজন্য এমনটা দাঁড়ায় না যে ঐশ্বরিক বিষয়গুলোর স্বরূপও সামান্য বিষয়; পূর্বচিহ্নগুলোর পূর্বাভাস আগে থেকেই নিজস্ব অর্থের অধিকারী; কেননা পূর্বচিহ্ন, অনুকরণ ক্রমে, সেই বিষয় স্পষ্ট করে তোলে যা প্রতীক্ষিত, ও ভাবীকালকে উপলব্ধ ভাবে পূর্বদৃষ্ট করে। এইভাবে আদম তাঁরই পূর্বচিহ্ন যাঁর আসার কথা, ও শৈল হলো খ্রিষ্টের পূর্বচিহ্ন (গ); শৈলের সেই জল হলো লোগোস-বাণীর জীবনদায়ী পরাক্রমের পূর্বচিহ্ন। প্রভু বলেন, *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক* (ঘ); সেই মান্নাও স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই জীবনময় রুটির পূর্বচিহ্ন (ঙ); এবং পতাকায় রাখা সেই সাপ (চ) হলো ক্রুশের দ্বারা সিদ্ধ সেই পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগের পূর্বচিহ্ন; সেজন্য যে কেউ তার দিকে তাকাত সে পরিত্রাণ পেত (ছ)। একই প্রকারে, যাত্রাপুস্তকের ঘটনাগুলোও এমন ভাবে বর্ণিত যাতে তাদেরই 'পূর্বচিহ্নিত' করা হয় যারা বাপ্তিস্মের দ্বারা পরিত্রাণকৃত। ইস্রায়েলীয়দের প্রথমজাতকেরা সেইভাবে পরিত্রাণকৃত হয়েছিল যেভাবে বাপ্তিস্ম-প্রাপ্তদের দেহ পরিত্রাণকৃত, কারণ অনুগ্রহ তাদেরই মঞ্জুর করা হচ্ছিল যারা রক্তে চিহ্নিত ছিল। কেননা মেষশাবকের রক্ত হলো খ্রিষ্টের রক্তের পূর্বচিহ্ন: প্রথমজাতকেরা হলো সেই প্রথম গড়া মানুষের পূর্বচিহ্ন যিনি শেষ পর্যন্ত বংশধারা দ্বারা 'হস্তান্তরিত' হওয়ায় এবং এর ফলে আবশ্যকীয় ভাবে আমাদের মধ্যে বিরাজমান হওয়ার ফলে আমরা সবাই আদমে মৃত্যুভোগ করি, এবং বিধানের সমাপ্তি ও খ্রিষ্টের আগমন পর্যন্ত মৃত্যু রাজত্ব করল (জ)। কিন্তু প্রথমজাতদের ঈশ্বর দ্বারা স্নেহ সহকারে বাঁচিয়ে রাখা হল যেন সেই সংহারক তাদের স্পর্শ না করে (ঝ), যাতে করে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, খ্রিষ্টে সঞ্জীবিত এই আমরা আদমে আর মৃত্যুভোগ করি না (ঞ)। সেই কালে সমুদ্র ও মেঘ বিস্ময় সৃষ্টি করেই বিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করত, কিন্তু পূর্বচিহ্ন হিসাবে ভাবীকালের জন্য আসন্ন অনুগ্রহ পূর্বচিহ্নিত করে। *'কে প্রজ্ঞাবান? কে এসব কিছু বোঝে?'* (ট): অর্থাৎ সেই সমুদ্র পূর্বচিহ্নের অর্থ অনুসারে ছিল সেই বাপ্তিস্ম যা ফারাও থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় যেইভাবে প্রক্ষালনটা দিয়াবলের অত্যাচার থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটায়। সমুদ্র শত্রুকে নিজেতে বিনাশ করত; এখানে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের শত্রুতা

মরে। জনগণ সেই সমুদ্র থেকে অক্ষত হয়ে বের হল; আমরাও জল থেকে মৃতদের মধ্য থেকেই জীবিত যেন আরোহণ করি—যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর অনুগ্রহে পরিত্রাণকৃত হয়ে (ঠ)। এবং সেই মেঘ হলো সেই দানের 'ছায়া' যা [পবিত্র] আত্মা থেকে আগত হয়ে আমাদের অঙ্গগুলো-নিপাতের দ্বারা ইন্দ্রিয়-আবেগের আগুন নিভিয়ে দেয়।

৩২। তবে এখন কি? যেহেতু মোশির উদ্দেশে পূর্বচিহ্নগত ভাবে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছিল, সেজন্য কি বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ অর্থহীন? আমরা যদি পূর্বচিহ্নগুলোর সঙ্গে সেগুলোতে বিদ্যমান প্রকৃত চিহ্নও অবজ্ঞা করতাম, তবে অবশ্যই আমাদের রহস্যগুলোতে মহৎ কিছু আর থাকত না। যদিও ঈশ্বর আমাদের পাপের জন্য নিজের একমাত্র জনিত পুত্র দান করেছেন, তবু মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা মহৎ এমন কিছুই আর হত না যা প্রকৃতি অতিক্রম করে, কেননা আব্রাহামও নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি। প্রভুর যন্ত্রণাভোগ গৌরবময় আর হত না, কেননা সেকাল থেকে ইস্‌হাকের বদলে (ক) একটা মেষশাবক যজ্ঞীয় বলির পূর্বচিহ্ন ছিল। পাতালে অবরোহণ ভয়ের ব্যাপার আর হত না, কেননা সেকাল থেকে যোনা তিন দিন তিন রাত ধরে (খ) মৃত্যুর পূর্বচিহ্ন ছিলেন। যে কেউ সত্যকে ছায়ার দ্বারা বিচার করে ও পূর্বচিহ্নগুলোর সঙ্গে সেগুলোর নির্দেশিত বাস্তবতা তুলনা করে এবং মোশি ও সমুদ্র দ্বারা সুসমাচারের গোটা ব্যবস্থা অর্থশূন্য করে, সে বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে ঠিক তাই করে। সেই সমুদ্রে কোন্‌ পাপের ক্ষমা, কোন্‌ জীবনের নবীকরণ ঘটে? মোশি দ্বারা কোন্‌ আত্মিক দান গৃহীত? পাপের কোন্‌ নিপাত হয়? সেকালের মানুষদের তো খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত্যু হয়নি, তাই তাঁর সঙ্গে তাদের পুনরুত্থানও হয়নি (গ)। তারা তো সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেনি (ঘ), নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যুও বহন করেনি (ঙ); পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করেনি ও সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেনি, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হয় (চ)। তাই, [হে ভ্রান্তমতপন্থী], তুমি কেন সেই বাপ্তিস্ম দু'টো তুলনা কর যেগুলো কেবল নামেই এক, যখন বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলোর পার্থক্য তত মহৎ যত মহৎ হত বাস্তবতার তুলনায় স্বপ্নের পার্থক্য, এবং যত মহৎ হত ছায়া ও প্রতিমূর্তির তুলনায় বাস্তব বিষয়ের পার্থক্য?

৩৩। কিন্তু মোশির উদ্দেশে বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে পবিত্র আত্মার উদ্দেশে বিশ্বাসও কম যোগ্যতার ব্যাপার; বরং, তাদের যুক্তি অনুসারে, সেই বিশ্বাস বিশ্বের ঈশ্বরে স্বীকৃতি দুর্বল করে। শাস্ত্রে বলে, *জনগণ প্রভুতে ও তাঁর দাস মোশিতে বিশ্বাস রাখল* [ক]। সুতরাং মোশি [পবিত্র] আত্মার সঙ্গে নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হলেন; এবং তিনি [পবিত্র] আত্মার নয়, খ্রিস্টেরই পূর্বচিহ্ন ছিলেন। বিধান-সেবাকর্মে তিনি ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার মধ্যস্থ। যখন মোশি জনগণকে ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয় সঞ্চার করতেন, তখন তিনি [পবিত্র] আত্মার পূর্বচিহ্ন ছিলেন না। কেননা বিধান *'স্বর্গদূতদের দ্বারা, একজন মধ্যস্থের মধ্য দিয়ে'* [খ] দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ মোশিরই মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই জনগণের দাবি অনুসারে যারা বলত, *তুমিই আমাদের সঙ্গে কথা বল; ঈশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন* [গ]। এর ফলে, মোশিতে বিশ্বাস সেই প্রভুকে উদ্দেশ্য করে যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার সেই মধ্যস্থ যিনি বলেছেন, *তোমরা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করতে* [ঘ]। তাই, যেহেতু বিশ্বাস মোশির মধ্য দিয়ে পূর্বনির্দেশিত হয়েছে, সেজন্য প্রভুতে বিশ্বাস কি সামান্য বিষয়? তাই যেহেতু মোশির উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেজন্য বাপ্তিস্মের উপরে [পবিত্র] আত্মা থেকে আগত অনুগ্রহও কি সামান্য অনুগ্রহ? তথাপি আমাকে এটা বলতে হয় যে, শাস্ত্রে 'মোশি' ও 'বিধান' বলা প্রথা স্বরূপ, যেমন, *'তাদের মোশি ও বিধান আছে'* [ঙ]। তাই [মোশির] সেই বিধান অনুযায়ী বাপ্তিস্মের কথা বলেই শাস্ত্র বলে, *'মোশির উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম হয়েছিল'* [চ]। তবে ছায়া ও পূর্বচিহ্ন ভিত্তিক যুক্তি লাগিয়ে যারা সত্যকে নিন্দা করে, তারা কেন আমাদের গর্বের বস্তু সেই প্রত্যাশাকে [ছ] ও যিনি নবজন্ম দ্বারা আমাদের যৌবনকে ঈগলের যৌবনের মত নবীকৃত করেন, আমাদের সেই ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তার সমৃদ্ধ উপহারকে অবজ্ঞার বস্তু বলে দেখায়? হ্যাঁ, আমাদের পরিত্রাণের মহৎ রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া এখনও-শিশুসুলভ মনের এমনকি দুধের বালকের মন-মানসিকতার চিহ্ন। শিক্ষা ক্ষেত্রে দীক্ষা যেমন, তেমনি ধর্মভক্তি অনুশীলন ক্ষেত্রেও যখন আমাদের সিদ্ধতার দিকে চালনা করা হচ্ছিল, তখন, শুরুতে, যা যা অধিক সহজ ও আমাদের ধারণশক্তি অনুযায়ী, তাতেই আমাদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। যিনি আমাদের বিষয় পরিচালনা করে থাকেন, তিনি অন্ধকারে পুষ্ট-করা যেন আমাদের চোখ উত্তোলন ক'রে আস্তে আস্তে

সত্যের মহৎ আলো লক্ষ করতে অভ্যস্ত করেন। আমাদের দুর্বলতার ব্যাপারে, তিনি নিজের প্রজ্ঞার ঐশ্বর্যের গভীরতায়, নিজের জ্ঞানের দুর্জ্ঞেয় বিচারগুলোতে (জ) এ মধুর ও আমাদের জন্য অধিক উপযোগী যত্ন আমাদের দেখালেন, ও সেইভাবে শুরুতে দেহের ছায়া দেখতে ও সূর্যকে জলে লক্ষ করতে অভ্যস্ত করলেন পাছে এমনটা হয় যে, বিশুদ্ধ আলো সাথে সাথে দেখতে গিয়ে আমরা অন্ধ হই। একই কারণে, '*আসন্ন মঙ্গলদানগুলির ছায়ার অধিকারী*' (ঝ) সেই বিধান ও নবীদের দ্বারা সিদ্ধতাপ্রাপ্ত পূর্বলক্ষণ তথা সত্যের অস্পষ্ট সেই পূর্বাভাস মনশ্চক্ষুর অনুশীলন বলে পরিগণিত যাতে এসব কিছু থেকে রহস্যময় প্রজ্ঞার দিকে পার হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয় (ঞ)। পূর্বচিহ্ন বিষয়ে একথা যথেষ্ট হোক। এবিষয়ে আরও সময় দেওয়া সম্ভব নয়, নইলে আনুষঙ্গিক আলোচনা আসল আলোচনার চেয়ে আরও বেশি ব্যাপক হবে।

১৫শ অধ্যায়। 'আমাদের জলেও বাপ্তিস্ম হয়' আপত্তিতে উত্তর। বাপ্তিস্মের কথাও আলোচিত।

৩৪। আমি বেশি আর কী বলব? তাদের বহির্গমন পথ বহু। তারা নাকি বলে, যদিও আমাদের জলে বাপ্তিস্ম হয়, তবু এর জন্য যে গোটা বিশ্বসৃষ্টির চেয়ে জলকেই বেশি সম্মান করব তা নয়, সেই জলকে পিতা ও পুত্রকে দেয় সম্মানের অংশীও করব না। এ তাদের ঘোষণা; এ এমন ক্রোধান্বিত লোকদের কথা যারা নানা আবেগের দরুন অন্ধকারাচ্ছন্ন অনুভূতিতে, যারা তাদের অপমান করেছে, যেকোন উপায়েই তাদের উপর প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু আমরা এবিষয় আলোচনা করায় পিছটান দেব না। হয় অজ্ঞদের উদ্বুদ্ধ করব, না হয় দুষ্কর্মাদের প্রতিরোধ করব। তবে [আমাদের আলোচনায়] একটু পিছনে ফিরে যাই।

৩৫। মানুষের প্রতি আমাদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তার ব্যবস্থা হলো মানুষকে পতন থেকে পুনরায় আহ্বান করা ও অবাধ্যতা-প্রণোদিত বিচ্ছিন্নতা থেকে তাকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতায় ফিরিয়ে আনা। এ উদ্দেশ্যে, মাংসে খ্রিষ্টের অবস্থান, সুসমাচারের জীবনাচরণ-দৃষ্টান্ত, দুঃখযন্ত্রণা, ক্রুশ, সমাধি ও পুনরুত্থান ঘটেছে যেন খ্রিষ্টের অনুকরণ

দ্বারা পরিত্রাণকৃত মানুষ তার আদি দত্তকপুত্রত্ব ফিরে পেতে পারে (ক)। সুতরাং, সিদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টের অনুকরণ করা প্রয়োজন, আর তা শুধু তাঁর জীবনকালে দেখানো কোমলতা, বিনম্রতা ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ ক'রে নয়, বরং তাঁর মৃত্যু-দৃষ্টান্তেরও অনুকরণে, যেমনটি খ্রিষ্টের অনুকারী সেই পল বলেন, *আমি তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হই, যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের নাগাল পেতে পারি* (খ)। তবে আমরা কেমন করে তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে পৌঁছতে পারব? বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সহ-সমাহিত হওয়ায়। তবে কেমন করে এই সমাধি ঘটে? এবং এই অনুকরণের উপকার কী? প্রথমে প্রয়োজন রয়েছে, প্রাচীন জীবনের গতিধারা বন্ধ করা। এ তো সম্ভব নয়, যদি আমরা প্রভুর বাণীমত 'ঊর্ধ্বলোক থেকে' (গ) নবজন্ম না নিয়ে থাকি। শব্দটা নিজেই যেভাবে দেখায়, নবজন্ম হল দ্বিতীয় জীবনের সূচনা; কিন্তু দ্বিতীয় জীবন শুরু করার জন্য আগে প্রাচীনটার সমাপ্তি ঘটানো দরকার। যেমন ক্রীড়াঙ্গনের বিবিধ দৌড়ে একটু বিরতি, একটু বিশ্রাম যাওয়াটার দৌড় থেকে ফিরে যাওয়ার দৌড় পৃথক করে, তেমনি জীবন-পরিবর্তনে এ প্রয়োজন বলে মনে হল যেন দু'টো জীবনের মধ্যে এক প্রকার মৃত্যু স্থান পায়, যাতে আগেকার যা তা সমাপ্ত করা যায়, ও পরে যা আসে, তার যেন সূচনা হয়। তবে পাতালে অবরোহণ কেমন করে সার্থক করা যেতে পারে? বাপ্তিস্মের মাধ্যমে খ্রিষ্টের সমাধির অনুকরণ করায়। কেননা যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তাদের দেহ একপ্রকারে জলে সমাহিত হয়। তাই বাপ্তিস্ম প্রতীকমূলক ভাবে দৈহিক ক্রিয়াকর্ম-পরিত্যাগ বোঝায়, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা এমন পরিচ্ছেদনে পরিচ্ছেদিত হয়েছ যা মানুষের হাতে সম্পাদিত নয়, যেন বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়ে খ্রিষ্টের পরিচ্ছেদনে মাংসময় দেহ ত্যাগ করতে পার* (ঘ)। এবং বাপ্তিস্ম একপ্রকারে আত্মাকে সেই কালিমা থেকে বিশুদ্ধ করে যা দৈহিক প্রবণতা আত্মার মধ্যে ঢুকিয়েছিল; যেমনটি লেখা আছে, '*তুমি আমাকে ধৌত করবে, আর আমি তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব*' (ঙ)। এজন্য আমরা ইহুদী প্রথা অনুসারে নিজেদের পরিশুদ্ধ করি না (চ), আমরা একটিমাত্র পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্ম স্বীকার করি, কেননা জগতের কাছে সেই মৃত্যুও এক, ও মৃতদের মধ্য থেকে সেই পুনরুত্থানও এক: বাপ্তিস্ম এসব কিছুর পূর্বচিহ্ন (ছ)। এজন্য জীবনের বিতরণকারী সেই প্রভু সেই বাপ্তিস্ম-সন্ধি স্থাপন করলেন যা মৃত্যু ও জীবনের পূর্বচিহ্ন

উপস্থাপন করে: জল হলো মৃত্যুর পূর্বচিহ্ন, [পবিত্র] আত্মা জীবনের অগ্রিমদান নিবেদন করেন। এইভাবে আমরা যা সন্ধান করছিলাম তা স্পষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ কেন [পবিত্র] আত্মার সঙ্গে জল সংযুক্ত করা হয়েছে। বাপ্তিস্মে দু'টো লক্ষ্য পরিলক্ষিত তথা, পাপদেহকে বিনাশ করা যেন সেই পাপদেহ মৃত্যুর উদ্দেশে ফল আর উৎপন্ন না করে (জ); [পবিত্র] আত্মায় জীবনযাপন করা ও পবিত্রতাজনক ফল দান করা (ঝ)। তবে, একদিকে জল হলো মৃত্যুর প্রতীক, কেননা দেহটা একটা কবরেই যেন গৃহীত; অন্যদিকে [পবিত্র] আত্মা জীবনী শক্তি সঞ্চার করেন ও আমাদের প্রাণকে পাপজনিত মৃত্যু থেকে আদি জীবনে নবীকৃত করেন (ঞ)। অতএব জল ও আত্মা থেকে 'ঊর্ধ্ব থেকে নবজন্মের' অর্থ এ: মৃত্যু জলে সাধিত হয়, আমাদের জীবন [পবিত্র] আত্মায় সার্থক হয়। তিন ডুবন ও তিন মিনতির মাধ্যমে বাপ্তিস্ম-মহারহস্য সিদ্ধি লাভ করে, যাতে মৃত্যুর পূর্বচিহ্ন প্রকাশিত হয়, ও ঈশ্বরজ্ঞান সম্প্রদানের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম-প্রাপ্তরা প্রাণের জন্য আলো অর্জন করে। কেননা জলে যদি কোন অনুগ্রহ থাকে, তা জলের প্রকৃতি থেকে নয়, বরং [পবিত্র] আত্মার উপস্থিতি থেকেই আসে; কেননা বাপ্তিস্ম তো '*দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে সদ্বিবেকের অঙ্গীকার*' (ট)। এজন্য পুনরুত্থান থেকে উৎসারিত জীবনের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রভু আমাদের সামনে সুসমাচার অনুযায়ী গোটা জীবনাচরণ তুলে ধরেন এটা জারি ক'রে যেন আমরা হিংসা না করি, কোমলপ্রাণ হই, লালসা-ভালবাসা থেকে অকলুষিত থাকি, অর্থপিপাসা-মুক্ত আচরণ পালন করি, যার ফলে আমরা, অনন্ত জীবনের যা স্বকীয় ও প্রকৃতিগত অধিকার এখন থেকে তাতে নিয়োজিত থেকে ইচ্ছাকৃত সঙ্কল্প ক্রমে সৎপথে নিজেদের সুরক্ষিত করি। তাই যে কেউ সুসমাচারের সংজ্ঞা দিতে ইচ্ছা ক'রে এমনটা বলত যে সুসমাচার হলো পুনরুত্থান থেকে উৎসারিত জীবনের পূর্বচ্ছবি, তাহলে, আমার মতে, সে সঠিক সংজ্ঞা থেকে তত দূরে যেত না। সুতরাং এসো, আমাদের সঙ্কল্পে ফিরে আসি।

৩৬। পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সাধিত হয় পরমদেশে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (ক), স্বর্গরাজ্যে আরোহণ, দত্তকপুত্রত্বে ফিরে যাওয়া, ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলে ডাকবার স্বাধীনতা, খ্রিষ্টের অনুগ্রহে সহভাগিতা, আলোর সন্তান বলে অভিহিত হওয়া, অনন্ত গৌরবে অংশগ্রহণ: এক কথায়, এ বর্তমান জীবনকালে ও ভাবী জীবনকালে আশীর্বাদের

পূর্ণতায় অবস্থান করা, অর্থাৎ প্রতিশ্রুতিতে গচ্ছিত যে সকল মঙ্গলদানের অনুগ্রহ আমরা বিশ্বাসের ভিত্তিতে উপভোগ করব বলে প্রত্যাশা করি, সেই সবকিছু আমরা এখন থেকেই তো যেন একটা আয়নায় দর্শন করি। অগ্রিমটা যখন এরূপ, তখন এর সিদ্ধি কেমন হবে? প্রথমফসল যখন এরূপ, তখন এর পূর্ণতা কেমন হবে? এ থেকেই আমরা [পবিত্র] আত্মা থেকে আগত অনুগ্রহ ও জলে সাধিত বাপ্তিস্মের মধ্যকার পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি, কেননা যোহন জলে, ও আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম সম্পাদন করেছেন। সেই যোহন বলেন, *আমি মনপরিবর্তনের উদ্দেশে জলে তোমাদের বাপ্তিস্ম দিই বটে, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতো বহন করতে যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন* [খ], এবং তিনি এখানে বিচারের পরীক্ষা আগুনে বাপ্তিস্ম বলে অভিহিত করেন, সেইভাবে যেভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *আগুন যাচাই করবে প্রত্যেকের কাজের গুণাগুণ'*, আরও, *'সেই দিনটিই তা ব্যক্ত করবে, যে দিনটি আগুনে প্রকাশিত হবে* [গ]। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন ধর্মভক্তির উদ্দেশে লড়াই-সংগ্রামে কেবল অনুকরণে নয় বরং বাস্তবেই খ্রিষ্টের খাতিরে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে ও পরিত্রাণ [পাবার জন্য] তাদের জলের প্রতীকের দরকার হল না যেহেতু তাদের নিজেদের রক্তেই তাদের বাপ্তিস্ম হয়েছে। আমি জলের বাপ্তিস্ম অস্বীকার করি বিধায়ই একথা বলছি তা নয়, কিন্তু এই লক্ষ্যেই তা বলছি যেন তাদেরই যুক্তি নিঃশেষ করতে পারি যারা [পবিত্র] আত্মার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, যা মিশ্রণযোগ্য নয় তা মিশ্রিত করে ও যা তুলনাযোগ্য নয় তা তুলনা করে।

১৬শ অধ্যায়। **পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র থেকে সবকিছুতেই বিচ্ছেদ্য নন, তথা বুদ্ধিসম্পন্ন জীবদের সৃষ্টিকালে, মানুষের পরিত্রাণ-ব্যবস্থায়, ভাবী বিচারকালে তিনি বিচ্ছেদ্য নন।**

৩৭। এসো, আদি আলোচনায় ফিরে যাই, তথা: কেমন করে পবিত্র আত্মা সবকিছুতেই পিতা ও পুত্র থেকে অবিচ্ছেদ্য ও কেমন করে তাঁদের মধ্যে কোনও ব্যবধান স্থান পায় না। নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান সংক্রান্ত পদে পল করিন্থীয়দের কাছে পত্র লিখতে গিয়ে বলেন, *সকলে নবীয় বাণী দিচ্ছে, এমন সময় অবিশ্বাসী বা দীক্ষাপ্রাপ্ত*

নয় এমন একজন প্রবেশ করছে, তবে সে দেখবে যে, সে সকলেরই দ্বারা যাচাইকৃত, সকলেরই দ্বারা বিচারিত, তার হৃদয়ের গোপন ভাবনা প্রকাশ পাবে; এবং এর ফলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরের আরাধনা করবে, বলবে: সত্যিই, ঈশ্বর তোমাদের মাঝে উপস্থিত (ক)। কেননা যখন পবিত্র আত্মার দানগুলো-বিতরণ অনুযায়ী কার্যকারী নবীয় বাণী দেওয়াটা থেকে এটা চিনে নেওয়া যেতে পারে যে, ঈশ্বর নবীদের মাঝে উপস্থিত, তখন এরাই [তথা ভ্রান্তমতপন্থীরাই] সিদ্ধান্ত নিক পবিত্র আত্মাকে কেমন স্থান বণ্টন করা উচিত: তাঁকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করা-ই অধিক ন্যায়সঙ্গত, নাকি তাঁকে সৃষ্টিকর্মে অবনমিত করা-ই অধিক ন্যায়সঙ্গত। যখন পিতর সাফীরাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *'তোমরা কেন প্রভুর আত্মাকে যাচাই করার জন্য একমত হয়েছিলে?', 'তোমরা তো মানুষের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা বলেছ'* (খ), তখন, সেই প্রশ্নে, পিতর এটা প্রমাণ করেন যে, পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ একই। এবং এইভাবেও তুমি শিখতে পারবে, প্রতিটি কর্মক্রিয়ায় [পবিত্র] আত্মা পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ও তাঁদের থেকে অবিচ্ছেদ্য। যখন পিতর কর্মক্রিয়াগুলো পৃথক পৃথক করেন ও প্রভু সেবাকর্মগুলো পৃথক পৃথক করেন, তখন পবিত্র আত্মা, এক একজনের যোগ্যতা অনুরূপে নিজের ইচ্ছাক্রমে অনুগ্রহদানগুলো বিতরণ করার জন্য উপস্থিত। প্রেরিতদূত বলেন, *বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক* (গ); *কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই এক ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন* (ঘ)। তথাপি, যেহেতু প্রেরিতদূত প্রথমত [পবিত্র] আত্মাকে, দ্বিতীয়ত পুত্রকে ও তৃতীয়ত পিতা ঈশ্বরকে উল্লেখ করেন, সেজন্য এটা আদৌ ভাবা উচিত নয় যে, অনুক্রমটা উল্টো করা হয়েছে। তিনি আমাদের প্রচলিত প্রথা থেকেই শুরু করেছেন: যখন আমরা উপহার পাই, তখন প্রথমে বিতরণকারী ব্যক্তির সঙ্গেই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, পরে প্রেরণকর্তার কথা ভাবি, এবং অবশেষে আমাদের মনকে উপহারের উৎস ও কারণের দিকে প্রসারিত করি।

৩৮। তুমি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে [পবিত্র] আত্মার সহভাগিতা সৃষ্টিকর্মের প্রথম সাধিত কর্মগুলো থেকে জানতে পার। বিশুদ্ধ ও বুদ্ধিসম্পন্ন ঊর্ধ্বজাগতিক কর্তৃত্বগুলো বাস্তবে পবিত্র ও নামেও পবিত্র বলে অভিহিত কারণ সেগুলো পবিত্র আত্মার সঞ্চারিত পবিত্রতার অধিকারী। কিন্তু স্বর্গীয় কর্তৃত্বগুলো ক্ষেত্রে এগুলো যে কেমন সৃষ্ট হয়েছে সেবিষয়ে কোন কথা নেই: এতে, যিনি জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনার প্রণেতা কেবল ইন্দ্রিয়যোগ্য বিষয়েরই স্রষ্টাকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তুমি যে তুলনামূলক পদ্ধতি দ্বারা দৃশ্য বিষয়গুলো থেকে শুরু করে অদৃশ্য বিষয়গুলোকে অনুমান করার সাধ্যের অধিকারী, সেই তুমি সেই স্রষ্টাকে গৌরবান্বিত কর যাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু তথা দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু, আধিপত্য, কর্তৃত্ব, অধিকার, সিংহাসন, প্রভুত্ব ও কোন সময় অস্তিত্বশীল নামহীনও অন্যান্য যত যুক্তিসম্পন্ন প্রকৃতিকে সৃষ্ট হয়েছে। এসমস্ত জীবদের সৃষ্টিতে তুমি, যা কিছু গড়া হয়েছে তার প্রাথমিক কারণ নিরীক্ষণ কর তথা সেই পিতাকে; কার্যকারী কারণটা নিরীক্ষণ কর তথা সেই পুত্রকে; সিদ্ধতা-দানকারী কারণটা নিরীক্ষণ কর তথা সেই [পবিত্র] আত্মাকে। এর ফলে এটা দাঁড়ায় যে, যে যে আত্মা সেবাকর্ম সংক্রান্ত ভূমিকার অধিকারী, সেই আত্মাগুলো পিতার ইচ্ছায় অস্তিত্বশীল, পুত্রের কর্মক্রিয়াতে অস্তিত্বে উপনীত, [পবিত্র] আত্মার উপস্থিতিতে সিদ্ধতা-প্রাপ্ত। এবং স্বর্গদূতদের সিদ্ধতা হলো পবিত্রতা ও সেই পবিত্রতায় স্থায়িত্ব। এবং কেউই মনে না করুক আমি এমনটা ঘোষণা করছি, তিনটে আদি-হিপোস্তাসিস (ক) রয়েছেন, সে এটাও মনে না করুক, আমি পুত্রের কর্মক্রিয়া অসিদ্ধ বলে গণ্য করি। কেননা জীবদের আদিকারণ এক [তথা পিতা], যিনি পুত্রের দ্বারা সক্রিয় ও [পবিত্র] আত্মায় সিদ্ধতা দান করেন। উপরন্তু, '*সকলের মধ্যে যিনি সবকিছু সাধন করে থাকেন*' (খ), সেই পিতাও অসিদ্ধ কোন কর্মক্রিয়া সাধন করেন না, পুত্রও অপূর্ণাঙ্গ কোন সৃষ্টিকর্ম সাধন করেন না যদি না সেই কর্ম [পবিত্র] আত্মা দ্বারা সিদ্ধতায় মণ্ডিত হয়। কেননা তেমনটা হলে তবে যিনি কেবল নিজেরই ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করেন, সেই পিতার পক্ষে পুত্রের কোন প্রয়োজন হত না, কিন্তু তিনি পুত্রের "দ্বারা" সৃষ্টি করতে ইচ্ছাই করেন; পুত্রের পক্ষেও কোন সহযোগিতা দরকার হত না যেহেতু তিনি পিতার সাদৃশ্যে কর্মসাধন করেন, কিন্তু পুত্রও [পবিত্র] আত্মার "দ্বারা" নিজের কর্ম সিদ্ধতা-মণ্ডিত করতে ইচ্ছাই করেন (গ)। '*কেননা*

প্রভুর লোগোস-বাণীতে গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার সমস্ত পরাক্রমের আবির্ভাব’ (ঘ)। তাই এখানে সেই বাণীর কথা বলা হচ্ছে না যা হাওয়ার স্পন্দনে অর্থবাহী ও কণ্ঠযন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত, সেই ফুৎকারের কথাও বলা হচ্ছে না যা সেই মুখের শ্বাস যা শ্বাসযন্ত্র দ্বারা বহিঃশ্বাসিত, কিন্তু সেই লোগোস-বাণীরই কথা বলা হচ্ছে যিনি আদিতে ঈশ্বরমুখী ছিলেন ও নিজেই ঈশ্বর (ঙ)। এবং ঈশ্বরের মুখের সেই ফুৎকার হলেন *‘সেই সত্যের আত্মা, যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন’* (চ)। তাই তুমি সেই ত্রিত্ব বুঝে নাও: আজ্ঞাদানকারী পিতা, সৃষ্টিকর্তা লোগোস-বাণী, দৃঢ়ীকরণকারী ফুৎকার। এবং যেহেতু লোগোস-বাণী বলতে মঙ্গলে দৃঢ়তা, অপরিবর্তনশীলতা ও স্থিতিশীলতা বোঝায়, সেজন্য সেই দৃঢ়ীকরণ পবিত্রতায় সিদ্ধীকরণ ছাড়া আর কী বা হতে পারে? [পবিত্র] আত্মাকে ছাড়া কোন পবিত্রীকরণ নেই। স্বর্গীয় সমস্ত পরাক্রম স্বরূপে পবিত্র নয়, তেমনটা হলে তবে সেই পরাক্রমসমূহ পবিত্র আত্মা থেকে আদৌ পৃথক হত না; বরং সেগুলো নিজ নিজ আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতার অনুপাতে পবিত্র আত্মা থেকেই প্রয়োজনীয় পবিত্রতা গ্রহণ করে। যেমন গলন্ত লোহা থেকে আগুন চেনা যায় যদিও পদার্থটা ও আগুন আলাদা জিনিস, তেমনি স্বর্গীয় পরাক্রমগুলোতে সেগুলোর পদার্থ আহওয়া-বিশিষ্ট আত্মাও হতে পারে, অশরীরী আগুনও হতে পারে, যেমনটা লেখা আছে, *‘তিনি বাতাসকে করেন নিজের দূত, আগুনের শিখাকে নিজের সেবক’* (ছ)। সেজন্য সেগুলো এক স্থানে অস্তিত্বশীল ও দৃশ্যগত হয় ও নিজ নিজ দেহগত আকারে তাদেরই কাছে দর্শন দেয় যারা যোগ্য। তাই, সেগুলোর পদার্থের চেয়ে বহিঃস্থ সেই পবিত্রীকরণ [পবিত্র] আত্মার সঙ্গে সহভাগিতা গুণে সেগুলোতে সিদ্ধীকরণ আরোপ করে। এ পরাক্রমসমূহ মঙ্গলে অধ্যবসায়ী হতে হতে নিজ নিজ যোগ্যতা রক্ষা করে, কেননা নিজ নিজ ইচ্ছা-শক্তিতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও কখনও সত্যকার মঙ্গলের যত্ন-সেবায় ক্ষান্ত হয় না। যদি তুমি তোমার যুক্তি অনুসরণ করে [পবিত্র] আত্মাকে বাতিল কর, তবে স্বর্গীয় দূতবাহিনী ছত্রভঙ্গ হন, মহাদূতদের প্রভুত্ব বিলীন হয়, সমস্ত কিছু ভ্রান্ত হয়, তাঁদের জীবন বিধানবিহীন, শৃঙ্খলাবিহীন, বৈশিষ্ট্যবিহীন হয়। এবং দূতেরা যদি [পবিত্র] আত্মা থেকে অধিকার না পেয়ে থাকতেন, তাহলে কেমন করে বলতে পারতেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব?* (জ)। কেননা ‘পবিত্র আত্মার প্রেরণায়

ছাড়া কেউ বলতে পারে না 'যিশু প্রভু', এবং ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কথা বলতে বলতে কেউ বলে না '*যিশু বিনাশ-মানতের বস্তু*' (ঝ); এ এমন কথা যা অবশ্যই সেই জঘন্য ও বিরোধী আত্মাগুলো বলত যেগুলোর পতন আমার এ ঘোষণা সত্য বলে প্রমাণিত করে যে, অদৃশ্য পরাক্রমগুলো স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী এবং গুণ ও রিপুর মধ্যকার ভারসাম্যে দাঁড়ায়, ফলত তাদের পক্ষে [পবিত্র] আত্মার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। আমি এটাও বলি যে, সেই গাব্রিয়েলও [পবিত্র] আত্মার পূর্বজ্ঞানের গুণে ছাড়া অন্যভাবে ভবিষ্যদ্বাণী দিতে অক্ষম। কেননা ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়াটা হলো পবিত্র আত্মার বিতরণ করা অনুগ্রহদানগুলোর একটা বিশেষ। যিনি আদেশ পেয়েছিলেন তিনি '*কামনা-বাসনার মানুষের কাছে*' (ঞ) দর্শনের রহস্যগুলো জানিয়ে দেবেন, তাঁর কাছে গুপ্ত বিষয় শেখাবার প্রজ্ঞা পবিত্র আত্মা থেকে ছাড়া অন্য কোথা থেকে এসেছিল? কেননা রহস্য-উদ্ঘাটন [পবিত্র] আত্মাকেই বিশেষভাবে মানায়, যেমনটা লেখা আছে, '*আমাদের কাছে ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন*' (ট)। সিংহাসন ও প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব, এসমস্ত কেমন করে সুখময় জীবন যাপন করতে পারতেন যদি না তাঁরা '*অনুক্ষণ স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করতেন?*' (ঠ)। কিন্তু [পবিত্র] আত্মা ছাড়া তেমন দর্শন পাওয়া সম্ভব নয় (ড)। রাতে যদি তুমি ঘর থেকে আলো সরিয়ে দিতে তাহলে তোমার চোখ অন্ধ ও তোমার ইন্দ্রিয়গুলো অবশ, মূল্যবান জিনিস অচেনা হয়ে যেত, সোনা ও লোহা একইভাবে পদদলিত হত যেহেতু সেগুলোকে চিনে নেওয়াটা সম্ভব হত না; একই প্রকারে, বুদ্ধিগত জগতে [পবিত্র] আত্মাকে ছাড়া শেষ পর্যন্ত বিধান সম্মত জীবন যাপন করা সম্ভব নয়; কেননা অবস্থা এমন হত যেমন সেনাপতি-ছাড়া বাহিনীর শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা সঙ্গীত-পরিচালক না থাকলে সমবেত গানের সঙ্গতি রক্ষা করা। সেরাফদূতেরা কেমন করে '*পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র*' (ঢ) গাইতে পারতেন যদি [পবিত্র] আত্মা দ্বারা তাঁদের শিখিয়ে দেওয়া না হত ধর্মভক্তি ক্ষেত্রে ক' বার এ গৌরবারোপণ-স্ততিবাদ ঘোষণা করা উচিত? অতএব, যখন ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর প্রশংসা করেন, যখন তাঁর পরাক্রমসমূহ তাঁর প্রশংসা করেন, তখন তেমনটা ঘটে [পবিত্র] আত্মার সহযোগিতার ফলে। যখন তাঁর পাশে রয়েছেন সহস্র সহস্র দূত ও অগণন সেবাকর্মী, তখন [পবিত্র] আত্মার পরাক্রমেই তাঁরা নিজ নিজ ভূমিকা অনিন্দনীয় ভাবে পালন করেন। ঈশ্বরের

সেবাকর্মে নিযুক্ত ও পরাক্রমগুলোর পারস্পরিক সঙ্গতি পালনে বিদ্যমান সেই স্বর্গীয় ও অনির্বচনীয় সুর-সঙ্গতি টিকে থাকতে পারত না যদি না [পবিত্র] আত্মা তা বাঁচিয়ে রাখতেন। তাই, জীবদের অস্তিত্ব দানকালে যে জীব অগ্রগতির ফলে নিজ সিদ্ধতা অর্জন করে না কিন্তু সৃষ্টিকাল থেকেই সরাসরিই সিদ্ধতা-প্রাপ্ত, সেই জীবদের মধ্যে পবিত্র আত্মা উপস্থিত: তিনিই সেই জীবদের সত্তার সিদ্ধীকরণ ও পূরণকরণের উদ্দেশ্যে নিজের অনুগ্রহ তাঁদের উপর আরোপ করেন।

৩৯। মানব পরিত্রাণের যে ব্যবস্থা *আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্ট* (ক) ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা অনুসারে বাস্তবায়িত করেছেন, সেই ব্যবস্থা বিষয়ে কেই বা এটা অস্বীকার করতে পারবে, সেই ব্যবস্থা [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহে সিদ্ধি লাভ করে? তুমি যদি অতীতকালের কথা বিবেচনা করতে ইচ্ছা কর, যেমন পিতৃকুলপতিদের আশীর্বাদ, বিধানের মাধ্যমে দেওয়া সহায়তা, সেই সমস্ত পূর্বচিহ্ন, ভবিষ্যদ্বাণী, যুদ্ধ-সংগ্রামে বীরত্ব, ধার্মিকদের সম্পাদিত পরাক্রম-কর্ম, এবং সেই সঙ্গে মাংসে প্রভুর আগমন সংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহও বিবেচনা করতে ইচ্ছা কর, তোমাকে এটা মেনে নিতে হবে যে, সবকিছু [পবিত্র] আত্মার মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। শুরুতে তিনি প্রভুর খ্রিস্মা-তেল হলেন যা প্রভুর নিজের মাংস থেকে অবিচ্ছেদ্য, যেমনটা লেখা আছে, *'যাঁর উপরে তুমি আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই আমার প্রিয় পুত্র'* (খ) এবং *'ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত করলেন'* (গ)। পরবর্তীকালে [খ্রিষ্টের] সমস্ত কাজকর্ম [পবিত্র] আত্মার সহায়তায় সাধিত হল। তিনি তখনই ছিলেন যখন খ্রিষ্টকে দিয়াবলের প্রলোভনের সম্মুখীন করা হলো; লেখা আছে, *'যিশু পরীক্ষিত হবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন'* (ঘ)। তিনি সেসময়ও তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে উপস্থিত ছিলেন যখন যিশু পরাক্রম-কর্ম সম্পাদন করতেন: *আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে অপদূত তাড়াই,* [ইত্যাদি] (ঙ)। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পরে পবিত্র আত্মা তাঁকে আর কখনও ত্যাগ করেননি। যখন প্রভু মানুষকে নবীকৃত করতে ও তাকে সেই অনুগ্রহ ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা করলেন যা মানুষ ঈশ্বরের ফুৎকারের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল কিন্তু হারিয়ে ফেলেছিল (চ), তখন শিষ্যদের মুখমণ্ডলের উপর ফুঁ দেওয়ার সময়ে তিনি কী বলেন? *পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর,*

তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে (ছ)। এবং মণ্ডলীর অনুক্রম-ব্যবস্থা কি [পবিত্র] আত্মা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে ও অতিনিশ্চিত ভাবে সাধিত নয়? কেননা পলের কথামত তিনিই মণ্ডলীকে দিয়েছেন ‘*প্রথমত প্রেরিতদূতদের, দ্বিতীয়ত নবীদের, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুদের; তারপর পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান এবং উপকারিতার, শাসনের, ও নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান*’ (জ)। এ অনুক্রম-ব্যবস্থা [পবিত্র] আত্মার দানগুলো-বিতরণ অনুযায়ী (ঝ)।

৪০। যে কেউ মনোযোগ সহকারে ভাবে, সে এটাও উপলব্ধি করবে যে, স্বর্গ থেকে প্রভুর প্রতীক্ষিত আবির্ভাব-ক্ষণেও পবিত্র আত্মা অনুপস্থিত হবেন না, যদিও কেউ না কেউ মনে করে তিনি অনুপস্থিত থাকবেন। তিনি বরং প্রভুর সেই ঐশপ্রকাশের দিনেও উপস্থিত হবেন যখন তিনি জগৎকে ন্যায়বিচারে বিচার করবেন, তিনিই যে স্বয়ং ধন্য ও অনন্য ভগবান (ক)। কেননা, যারা যোগ্য, তাদের জন্য ঈশ্বর দ্বারা পূর্বনিরূপিত মঙ্গলদানগুলো বিষয়ে কেইবা এতই অজ্ঞ হবে যে এটা মেনে নেবে না যে, ধার্মিকদের মুকুটও সেই [পবিত্র] আত্মার এমন দান যা অধিক ঐশ্বর্যময়, উৎকৃষ্ট ও সিদ্ধতর উপহার যেহেতু আত্মিক গৌরব এক একজনকে নিজ নিজ সৎকর্মের অনুপাতে প্রদান করা হয়? পবিত্রজনদের গৌরবে পিতার কাছে অনেক বাসস্থান আছে (খ), তথা, যোগ্যতা অনুযায়ী পার্থক্য: ‘*গৌরবের দিক দিয়ে একটা তারার চেয়ে অন্য তারা ভিন্ন; তেমনি মৃতদের পুনরুত্থান*’ (গ)। যারা মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছে (ঘ) ও [পবিত্র] আত্মার গৃহীত প্রথমফসলকে অক্ষুণ্ন ও হ্রাসীকৃত-নয় এমন অবস্থায় রক্ষা করেছে, তারাই একথা শুনতে পাবে, ‘*বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব*’ (ঙ)। একই প্রকারে, যারা নিজেদের জঘন্য আচরণে পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিয়েছে অথবা গৃহীত দানকে বৃদ্ধি করেনি, তারা যা পেয়েছিল তা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে (চ) এবং অনুগ্রহ অন্যের হাতে স্থানান্তরিত হবে, অথবা, সুসমাচার-রচয়িতাদের মধ্যে একজনের কথা অনুসারে, তাদের একেবারে টুকরো টুকরো করা হবে (ছ); এবং এই ‘একেবারে টুকরো টুকরো করাটার’ অর্থ হলো [পবিত্র] আত্মা থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, কারণ দেহকে এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না যার ফলে একটা টুকরো দণ্ডে দেওয়া

হবে ও অপর টুকরোটা দণ্ড এড়াবে। কেননা এমনটা রূপকথার মত হত, ও ন্যায়বিচারকের অযোগ্য ব্যবহার হত যদি পুরা ব্যক্তি অপরাধ করলে সেই ব্যক্তির অর্ধেক অংশ মাত্র দণ্ডিত হত। প্রাণকেও দু'ভাগে কাটা যায় না, যার ফলে পুরা প্রাণ পাপের মন-মানসিকতা দ্বারা পূর্ণ হবে ও দুষ্কর্ম সাধনের জন্য দেহকে ব্যবহার করবে। কিন্তু, যেমন বলেছি, সেই কাটাটা হলো [পবিত্র] আত্মা থেকে প্রাণের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, চিরকালীন বিচ্ছেদ। কেননা যদিও পবিত্র আত্মা অযোগ্যদের সঙ্গে মেলামেশা মানেন না, তবু এমনটা মনে হয়, তিনি কোন প্রকারে তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন যারা মনপরিবর্তনের গুণে পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় একবার সবসময়ের মত মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছে; কিন্তু যে প্রাণ তাঁর অনুগ্রহ কলুষিত করেছে, তিনি সেই প্রাণ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকবেন। এজন্য এমন কেউই নেই যে পাতাল থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করবে, মৃত্যুতেও এমন কেউই নেই যে তাঁকে স্মরণ করবে, কারণ [পবিত্র] আত্মার সহায়তা আর নেই। সুতরাং, এটা কেমন ভাবা যেতে পারে যে, বিচার পবিত্র আত্মাকে ছাড়া সম্পাদিত হবে যখন লোগোস-বাণী দেখান, তিনি নিজেই হলেন ধার্মিকদের পুরস্কার, যখন অগ্রিমের স্থানে পূর্ণতা দেওয়া হবে, ও যখন অপরাধীদের প্রথম দণ্ড তখনই জারীকৃত হবে যখন তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হবে যা তারা মনে করছিল তাদেরই অধিকার? (জ)। কিন্তু, পিতা ও পুত্রের সঙ্গে [পবিত্র] আত্মার সংযোগের সপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এটা যে, তাঁর বিষয়ে বলা হয় [পবিত্র] আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে সেই একই সম্পর্কে রয়েছেন যে সম্পর্কে আমাদের মধ্যে অবস্থানকারী [পবিত্র] আত্মা আমাদের এক একজনের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রেরিতদূত বলেন, *মানুষের অন্তরে যে [পবিত্র] আত্মা বিদ্যমান, তিনি ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বর থেকে আগত আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না* (ঝ)। এবিষয়ে এই কথা যথেষ্ট হোক।

১৭শ অধ্যায়। পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে "সহগণিত" করতে নেই, কিন্তু তাঁকে "উপগণিত" করা উচিত, যারা একথা বলে তাদের কাছে উত্তর। তাছাড়া "সহগণনায়" বিশ্বাস সম্পর্কে সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত।

৪১। আমরা যা "উপগণনা" বলি ও তারা যে কোন্ অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করে, তা উপলব্ধি করা সহজ নয়। শব্দটা যে জাগতিক তত্ত্ববিদ্যা থেকে আনা হয়েছে ও আমাদের মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে, একথা সকলের কাছে জানা। কিন্তু, শব্দটা যে আমাদের এখানে উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তা পরীক্ষা-নীরিক্ষার বিষয়। সুতরাং, অসার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যারা, তারা বলে, এমন সাধারণ শব্দ রয়েছে যেগুলো ব্যাপক অর্থ বহন করায় বহু বিষয়ে নিজেতে অন্তর্ভুক্ত করে; আবার কতগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলো বিশিষ্ট অর্থ বহন করে, এবং আরও কতগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলো অন্য শব্দগুলোর চেয়ে আরও বিশিষ্টতর অর্থ বহন করে। উদাহরণ স্বরূপ, 'সত্তা' সাধারণ এমন শব্দ যা প্রাণবিহীন ও প্রাণবিশিষ্ট বস্তু ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত। 'প্রাণী' শব্দটা আরও বেশি বিশিষ্ট এমন শব্দ যা আগেরটার চেয়ে সীমিত অর্থগুলো বহন করে, কিন্তু পরবর্তী শব্দগুলোর চেয়ে ব্যাপক অর্থগুলো বহন করে। কেননা 'প্রাণী' শব্দটা সেই সমস্ত জীবদের প্রকৃতি ধারণ করে যেগুলো যুক্তিবিশিষ্ট ও যুক্তিবিহীন। 'প্রাণী' শব্দের চেয়ে আরও বেশি বিশিষ্ট শব্দ হলো 'মানুষ', এবং 'মানুষ' শব্দের চেয়ে আরও বেশি বিশিষ্ট ভাবে 'পুরুষ' শব্দটা রয়েছে, ও 'পুরুষ' শব্দটার চেয়ে আরও বেশি বিশিষ্ট ভাবে রয়েছে 'পিতর', 'পল', 'যোহন' ব্যক্তি-বিশিষ্ট নাম। তবে যখন তারা [অর্থাৎ সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা] "উপগণনার" কথা বলে, তখন কি শব্দটা যাতে পরিসীমিত, সেই সাধারণ শব্দের বিভক্তি বোঝায়? কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তারা এমন ক্ষিপ্ততার পর্যায়ে নিজেদের প্রসারিত করে যাতে বিশ্বের ঈশ্বরকে সাধারণ এমন বিমূর্ততা বলে দেখায় যা কেবল তাত্ত্বিক ভাবে উপলব্ধ ও যার সত্তা বাস্তব একটা পদার্থে অস্তিত্বশীল নয় ও নিম্নপদস্থ নানা জীবে বিভক্ত; যার ফলে এ বিভক্তি "উপগণনা" বলেও অভিহিত। এধরনের কথা উন্মাদ মানুষও উচ্চারণ করত না। কেননা, অভক্তিকে বাদে, তারা নিজেদের অভিপ্রায়ের বিপরীত যুক্তিকে যুগিয়ে দেয়। কেননা, তাদের মতে, যা কিছু বিভক্ত তা সেই একই সত্তার অধিকারী যার সেইগুলোও অধিকারী যেগুলো সেগুলো

থেকে বিভক্ত। কিন্তু এমনটা মনে হচ্ছে, অযৌক্তিকতার স্পষ্ট প্রমাণের সামনে আমরা যুক্তির অভাবী ও তাদের অসঙ্গতি বিষয়ে কেমন প্রতিবাদ করা যেতে পারে তা জানি না, এর ফলে আমি মনে করি, হয় তো তারা তাদের উন্মাদনা থেকে কিছুটা উপকার পায়। প্রতিরোধ করে না এমন নরম ও দুর্বল দেহকে আঘাত করা ভাল লাগে না, তেমনি যারা প্রকাশ্যে উন্মাদনায় পতিত তাদের শক্তি সহকারে খণ্ডন করাও সম্ভব নয়। তাই তাদের নিন্দনীয় অভক্তিকে নীরবে না দেখার ভান করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কিন্তু ভাইদের প্রতি ভালবাসা ও বিরোধীদের ভারী আঘাত আমাদের শান্তি দেয় না।

৪২। আসলে তারা কী বলে? তাদের দুঃসাহসের কথা লক্ষ কর: 'আমরা এটা বলি যে, "সহগণনা" সেই জীবদের মানায় যেগুলো সমযোগ্যতার অধিকারী, "উপগণনা" সেগুলোকে মানায় যেগুলো নিম্নাবস্থা-সম্পর্কে উপস্থাপিত। একথার বলার অর্থ কী? আমি তোমাদের অসাধারণ প্রজ্ঞা বুঝতে পারি না। তবে কি সোনা সোনার সহগণিত হবে কিন্তু সোনার সহগণনার যোগ্য নয় যে সীসা, তা পদার্থ হিসাবে কম মূল্যের হওয়ায় উপগণিত হবে? এবং তোমরা কি, গণনাতে [ও সংখায়ও] এমন শক্তি আরোপ কর যার ফলে মূল্যহীন বিষয়ের মূল্য বাড়ানো যায় বা মূল্যবান বিষয়ের মূল্য কমানো যায়? তবে তুমি সোনাকেও তার চেয়ে মূল্যবান পাথরের "উপগণনা" করবে ও এগুলোর মধ্যে যেগুলো আলোবিহীন ও ক্ষুদ্রতম সেগুলোকে উজ্জ্বলতর ও বৃহত্তর গুলোর "উপগণনা" করবে? কিন্তু এরা যারা অদ্ভুত কিছু না কিছু বলার বা শুনবার জন্য ছাড়া অন্য সময় পায় না, তারা কী বলবে? তবে স্তোয়া-মতবাদপন্থীদের ও এপিকুরুস-পন্থীদের সঙ্গে এরাও অভক্তির সংগ্রহক বলে অভিহিত হোক। প্রকৃতপক্ষে, অধিক মূল্যবান বস্তুর তুলনায় নগণ্য বস্তুগুলোর মধ্যে কোন্ ধরনের "উপগণনা" থাকতে পারবে? কেমন করে ব্রঞ্জের মুদ্রাকে সোনার মুদ্রার "উপগণনা" করা যাবে? তারা বলে, 'আমরা এমনটা বলি না আমরা দু'টো মুদ্রার অধিকারী: কিন্তু বলি, আমরা একটা ও একটার অধিকারী'। তবে এ দু'টোর মধ্যে কোন্টা অন্যটার "উপগণিত" হবে? কারণ এইভাবে দু'টোই একইভাবে ব্যক্ত। তুমি যদি এক একটাকে একক ভাবে গণনা কর, তাহলে তুমি তো যোগ্যতার সমতা স্থির কর যেহেতু তুমি সমান ভাবে সেগুলোকে গণনা কর; যদি সেগুলোকে যুক্ত কর, তাহলে তুমি পুনরায় সেগুলোর যোগ্যতা একীভূত করবে। সেই দু'টো বস্তুর মধ্যে

যেটা পরে গণিত, সেটা "উপগণনার" অধীন হবে; যে গণনা করে, সবকিছু তার উপরেই নির্ভর করে: সে তো ব্রঞ্জের মুদ্রা থেকেও গণনা-প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। কিন্তু এসো, তাদের অজ্ঞতা খণ্ডন পরবর্তীকালের জন্য স্থগিত করে আমরা প্রধান বিষয়গুলো নিয়ে এগিয়ে যাই।

৪৩। তোমরা কি এটাও বল যে, পুত্র পিতার "উপগণিত" ও [পবিত্র] আত্মা পুত্রের "উপগণিত"? নাকি কেবল [পবিত্র] আত্মার উপর "উপগণনা" আরোপ কর? কেননা যদি তোমরা পুত্রকেও "উপগণিত" কর, তাহলে তোমরা পুনরায় একই অভক্তির কথা উচ্চারণ কর, তথা, সত্তার ভিন্নতা, যোগ্যতার নিম্নপর্যায়, পরবর্তীকালীন প্রজনন; এবং শেষবারেরই মত একক শব্দ প্রয়োগে একমাত্র জনিতজনের বিরুদ্ধে সমস্ত নিন্দাজনক কথা ব্যক্ত করবে। এদের প্রতিবাদ করা এমন ব্যাপার যা এ বর্তমান কাজের চেয়েও দীর্ঘতর, বিশেষ ভাবে এ কারণে যে, আমাদের শক্তির অনুপাত অনুসারে আমরা অভক্তি অন্যত্রও খণ্ডন করেছি। তারা যদি মনে করে, কেবল [পবিত্র] আত্মাকেই "উপগণনা" মানায়, তাহলে এটা জেনে নিক যে, [পবিত্র] আত্মা প্রভুর সঙ্গে ঠিক সেইভাবে উল্লিখিত যেভাবে পুত্রও পিতার সঙ্গে উল্লিখিত। কেননা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম একইভাবে প্রকাশিত হয়েছে [ক]। বাপ্তিস্মে সম্প্রদান করা বাণীর অনুক্রম অনুসারে পুত্র যেমন পিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, [পবিত্র] আত্মাও তেমনি পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যখন [পবিত্র] আত্মা পুত্রের "সহঅনুক্রমিত", ও পুত্র পিতার "সহঅনুক্রমিত", তখন এটা স্পষ্ট যে, [পবিত্র] আত্মাও পিতার "সহঅনুক্রমিত"। সুতরাং, যখন তাঁদের নাম এক ও একই পংক্তিতে নির্দিষ্ট অনুক্রম অনুযায়ী বলে প্রদর্শিত, তখন এমনটা কি বলা যেতে পারে যে, একজন "সহগণিত", অন্যজন "উপগণিত"? এক কথায়, বিশ্বের কোন্ জীব গণিত হওয়ার ফলে নিজের প্রকৃতি থেকে নিম্নপতিত হল? গণিত বিষয়গুলো কি সেইভাবে থেকে যায় না যেভাবে আদিতে প্রকৃতি অনুসারে জনিত হয়েছিল? এবং গণনা কি বহু বিষয়ের মধ্যে নির্দেশক চিহ্ন নয়? কোন কোন বস্তু গণনা করা হয়, অন্য অন্য বস্তু পরিমাপ করা হয়, অন্য অন্য বস্তু ওজন করা হয়: যেগুলোর প্রকৃতি ক্রমাগত, সেগুলোকে মাপের যন্ত্র দিয়ে দখল করি; যেগুলোর প্রকৃতি সীমাবদ্ধ, সেগুলোকে গণনার বশীভূত করি, সেগুলো বাদে যেগুলো তাদের সূক্ষ্মতার জন্য পুনরায় পরিমাপযোগ্য হয়;

যেগুলো ভারী, সেগুলোর ওজন দাঁড়িপাল্লার ঝুল দিয়ে গণনা করি। কিন্তু, যেহেতু সেগুলোর পরিমাপ জানবার জন্য আমরা বিশেষ বিশেষ চিহ্ন উদ্ভাবন করেছি, সেজন্য যে এই ভিত্তিতে নির্ধারিত বিষয়গুলোর প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারব, তা অবশ্যই হতে পারে না। সুতরাং, আমরা যেমন ভারী বস্তুগুলোকে তাদের মধ্যে উপ-ওজন করি না যদিও একটা সোনার ও অন্যা সীসার, এবং যেমন পরিমাপযোগ্য বস্তুগুলোকে উপপরিমাপ করি না, তেমনি গণিত বস্তুগুলোকেও আদৌ “উপগণনা” করব না। তবে, যখন কোনও কিছুই “উপগণিত” হওয়া মানে না, তখন এরা কেনই বা ঘোষণা করতে পারে, [পবিত্র] আত্মাকে “উপগণিত” হওয়া মানায়? কিন্তু, গ্রীক-যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা মনে করে, যোগ্যতার পদ অনুসারে বা পদার্থের নগণ্যতা অনুসারে যা নিম্নপদস্থ, তা “উপগণনা” করা উচিত।

১৮শ অধ্যায়। সেই তিনটে হিপোস্তাসিস (ক) ঘোষণা করায় আমরা ‘মনার্খিয়া’ (খ) ধর্মতত্ত্ব রক্ষা করি। তাদেরও যুক্তি খণ্ডন করা হবে যারা [পবিত্র] আত্মার “উপগণনা” সমর্থন করে।

৪৪। এক পিতাকে, এক পুত্রকে ও এক পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান করায় প্রভু তাঁদের একটা সংখ্যা দ্বারা নয় একক ভাবেই দান করেছেন। বাস্তবিকই তিনি তো ‘একজন প্রথম, একজন দ্বিতীয় ও একজন তৃতীয়’ বলেননি, ‘একে, দুইয়ে, তিনে’ও তিনি বলেননি, কিন্তু সেই পবিত্র নাম তিনটে দ্বারা তিনি পরিত্রাণদায়ী বিশ্বাস-জ্ঞান আমাদের দান করলেন। তাই, যা আমাদের ত্রাণ করে, তা হলো বিশ্বাস। সংখ্যা এমন চিহ্ন বলে গৃহীত যা দ্বারা বিষয়গুলোর সংখ্যা বুঝতে পারি। কিন্তু এরা, যারা নিজেদের বিরুদ্ধে কৃত অপব্যবহার বিষয়ে সর্বস্থানে নালিশ করে বেড়ায়, তারা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গণনা করার সাধ্যও ব্যবহার করে; এবং একটা সংখ্যা যোগ করার ফলে যদিও কারও কখনও পরিবর্তন হয়নি, তবু ঐশ্বরিক স্বরূপ ব্যাপারে এরা সংখ্যাটা সন্দেহজনক ভাবে লক্ষ করে পাছে এরা সহায়ক [পবিত্র আত্মাকে] দেয় সম্মানের মাত্রা অতিক্রম করে। হে অধিক প্রজ্ঞাবানেরা, বিশেষভাবে অগম্য বিষয়াদিই সংখ্যার উপরে অবস্থান করুক: হিব্রুদের সেই প্রাচীন ভক্তির আদর্শ অনুসারে যা ঈশ্বরের অনুচ্চারণীয় নাম বিশেষ বিশেষ

চিহ্ন দ্বারা খোদাই করত (গ) এবং এই ভাবেও সবকিছুর উপরে সেই নামের শ্রেষ্ঠতা নির্দেশ করত। যদি গণনা করা দরকার হয়, তাহলে অন্তত এতেই যেন সত্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অনির্বচনীয় বিষয়াদি নীরবতা দ্বারা সম্মানিত হোক, অথবা পবিত্র বিষয়গুলো ভক্তি সহকারে গণনা করা হোক। ঈশ্বর এক, তিনি সেই পিতা; একমাত্র জনিত পুত্র এক; পবিত্র আত্মা এক। আমরা এক একটা হিপোস্তাসিস (ঘ) এককভাবে উচ্চারণ করি: যখন সেগুলোকে গণনা করা দরকার হয়, তখন বুদ্ধিহীন গণনা-পদ্ধতি দ্বারা যেন বহু-ঈশ্বরবাদে নিজেদের চালিত হতে না দিই।

৪৫। কেননা আমরা যখন এক থেকে ঊর্ধ্বের দিকে অগ্রসর হই, তখন যোগ করায় গণনা করি না: হ্যাঁ, এক ও দুই ও তিন বলতে বলতে বা প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলতে বলতে আমরা সংখ্যাগুলো যোগ করি না। ‘*আমি, ঈশ্বর, আমিই প্রথম* ও *আমিই শেষজন*’ (ক)। আজ পর্যন্ত আমরা কোনও দ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা শুনিনি। যখন আমরা ‘ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরকে’ (খ) উপাসনা করি, তখন হিপোস্তাসিস-ত্রয়ের (গ) স্বকীয় বৈশিষ্ট্য স্বীকার করি ও থেওলোগিয়াকে (ঘ) একটা বিভক্ত বহুতায় বিক্ষিপ্ত না করে সেই ঐশ্বরিক মনার্খিয়ার (ঙ) প্রতি বিশ্বস্ত থাকি। সুতরাং, পিতা ঈশ্বরে ও একমাত্র জনিত ঈশ্বরে, বলতে গেলে, ঈশ্বরত্বের প্রতিবিম্বিত পার্থক্যহীন একক প্রতিমূর্তি দর্শন করা হয়। পুত্র পিতাতে বিদ্যমান, পিতা পুত্রতে বিদ্যমান: যেহেতু ইনি যেমন তিনিও তেমন, ও তিনি যেমন ইনিও তেমন, সেজন্য এতেই তাঁদের ঐক্য। এর ফলে, ‘প্রসোপোন’ [πρόσωπον - ব্যক্তিদের] প্রাধান্য অনুসারে তাঁরা হলেন এক ও এক; কিন্তু স্বরূপের সহভাগিতা অনুসারে একজন ও অন্যজন হলেন এক। তবে, তাঁরা যখন এক ও এক, তখন কেমন করে তাঁরা দু’টো ঈশ্বরও নন? এই কারণে যে, রাজার প্রতিমূর্তিও রাজা বলে অভিহিত অথচ দু’টো রাজা নেই। রাজ-ক্ষমতাও খণ্ড করা হয় না, গৌরবও বিচ্ছিন্ন করা হয় না। যে অধিকার ও ক্ষমতা আমাদের উপরে রয়েছে তা যেমন এক, তেমনি আমরা যে গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ উত্তোলন করি তা-ও এক, বহুবিধ নয়, কারণ প্রতিমূর্তির প্রতি দেওয়া সম্মান আদিরূপের কাছে স্থানান্তর করে। এই উদাহরণে যা অনুকরণে প্রতিমূর্তি, এখানে তা স্বরূপে পুত্র। এবং যেমন চারুকলা ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রূপেই রয়েছে, তেমনি যুক্ততাবিহীন সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ ক্ষেত্রে ঐক্য ঈশ্বরত্বের সহভাগিতায়

রয়েছে। পবিত্র আত্মাও এক, তিনিও এককভাবে উচ্চারিত, যেহেতু যিনি এক তথা সেই পুত্রের দ্বারা, তিনি [তথা পবিত্র আত্মা] সেই পিতার সঙ্গে সংযুক্ত যিনি এক; এবং নিজের দ্বারা তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য সেই ধন্য ত্রিত্বকে পূর্ণ করেন। পিতা ও পুত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এতে যথেষ্ট প্রকাশিত যে, তাঁকে জীবদের বাহুল্যে স্থান দেওয়া হয় না, বরং তিনি একক বলে উচ্চারিত। কেননা তিনি বহুজনের মধ্যে একজন নন, কিন্তু তিনি একক কেননা যেমন পিতা এক ও পুত্র এক, তেমনি পবিত্র আত্মাও এক। তিনি সৃষ্ট প্রকৃতি থেকে তত দূরে রয়েছেন, সংযুক্ত ও বহুসংখ্যক বস্তুগুলো থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে যত দূরে রয়েছে একাকী একটা বস্তু। তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সেইভাবে ঐক্যে মিলিত যেভাবে একক এককের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় রয়েছে।

৪৬। [পবিত্র আত্মার] স্বরূপের সহভাগিতা সংক্রান্ত প্রমাণসমূহ যে শুধু উপরোল্লিখিত কথা থেকে আসে তা নয়, কিন্তু সেই প্রমাণসমূহ এ থেকেও আসে যে, তাঁর বিষয়ে বলা হয় তিনি ঈশ্বর থেকে: সবকিছু যে ঈশ্বর থেকে আগত সেই অনুসারে নয়, কিন্তু যিনি ঈশ্বর থেকে বের হয়ে আসেন তাঁরই মত; পুত্রের মত প্রজনন দ্বারা নয়, কিন্তু তাঁর মুখের ফুৎকার হিসাবে। কিন্তু মুখ যে একটা অঙ্গ তা আদৌ নয়, ফুৎকার যে এমন শ্বাস যা নিঃশেষ হয় তাও নয়; এই মুখ এমন যা ঈশ্বরকে মানায়, এবং সেই ফুৎকার হলো এমন জীবনময় সত্তা যা পবিত্রীকৃত করার অধিকার রাখে: এ থেকেই উপরোল্লিখিত সেই ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পায়, কিন্তু অস্তিত্বশীলতা যে কেমন, তা অনির্বচনীয় হয়ে থাকে। খ্রিষ্টের আত্মাও একথা বলেন, কারণ তিনি স্বরূপে অভ্যন্তরীণভাবে মিলিত। এজন্য '*খ্রিষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রিষ্টের নয়*' (ক)। সুতরাং, কেবল তিনিই যোগ্যভাবে প্রভুকে গৌরবান্বিত করেন, যেইভাবে শাস্ত্রে বলে, '*তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন*' (খ) কিন্তু সৃষ্টজীব হিসাবে নয় বরং এমন সত্যের আত্মা হিসাবে যিনি সত্যকে নিজেতে স্পষ্টভাবে উজ্জ্বল করে তোলেন, ও এমন প্রজ্ঞার আত্মা হিসাবে যিনি নিজের মহত্ত্বে সেই খ্রিষ্টকে প্রকাশ করেন যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা (গ)। এবং সহায়ক হিসাবে তিনি সেই সহায়কের [তথা পিতার] মঙ্গলময়তার চিহ্নসমূহ সঙ্গে করে বহন করেন যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন, এবং নিজের যোগ্যতায় তাঁরই মহত্ত্ব প্রকাশ করেন যাঁর থেকে তিনি বের হয়ে আসেন। তবে এক প্রকার প্রকৃতিগত একটা গৌরব

রয়েছে, যেমন আলো হলো সূর্যের গৌরব; এবং বাইরে থেকে আগত একটা গৌরবও রয়েছে: এ গৌরব এমন যা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকেই আরোপ করা হয় যে যুক্তিসঙ্গত ভাবে সেটা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত। এই গৌরব দ্বিবিধ: কেননা নবী বলেন, *পুত্র নিজের পিতাকে ও দাস নিজের প্রভুকে গৌরব আরোপ করে* (ঘ)। এ গৌরব দু'টোর মধ্যে দাসের দেওয়া গৌরব সৃষ্টকর্ম দ্বারা আরোপিত, কিন্তু যেটা, বলতে গেলে, ঘনিষ্ঠতা-বিশিষ্ট, তা [পবিত্র] আত্মা দ্বারা পূরণ করা হয়। কেননা যেমন নিজের বিষয়ে প্রভু [পিতা সম্পর্কে] বলেন, *তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি* (ঙ), তেমনি সেই সহায়ক সম্পর্কে তিনি বলেন, *তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন* (চ)। যেমন পুত্র সেই পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত হন যিনি বলেন *আমি তা [তথা পুত্রের নাম] গৌরবান্বিত করেছি, আবার তা গৌরবান্বিত করব* (ছ), তেমনি [পবিত্র] আত্মা গৌরবান্বিত হবেন পিতা ও পুত্রের সঙ্গে নিজের সহভাগিতার জন্য ও সেই একমাত্র জনিতজনের সাক্ষ্যদানের জন্য যিনি বলেন, *মানুষের যেকোন পাপ ও ঈশ্বরনিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মা-নিন্দার ক্ষমা হবে না* (জ)।

৪৭। যখন আমরা আলোসঞ্চারী কোন শক্তির প্রভাবে অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির সৌন্দর্যের উপর চোখ নিবদ্ধ রাখি ও সেটা দ্বারা সেই আদিরূপের [তথা পিতার] অতিসুন্দর দর্শন পর্যন্ত নিজেদের উত্তোলিত করি, তখন, যে দর্শন-অন্বেষীরা সত্যকে দর্শন করতে ভালবাসে, তাদের কাছে সেই প্রতিমূর্তির রহস্য উপলব্ধি করার শক্তি নিজেতে দান করার জন্য জ্ঞানের আত্মা অবিচ্ছেদ্য ভাবে উপস্থিত; তিনি তা বাইরে থেকে দেখান না, কিন্তু নিজেতেই সেই জ্ঞান অভিমুখে চালনা করেন। যেমন '*পুত্র ছাড়া কেউই পিতাকে জানে না*' (ক), তেমনি '*পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না 'যিশু প্রভু'*' (খ)। কেননা 'আত্মার দ্বারা' নয়, কিন্তু 'আত্মার প্রেরণায়' বলা হয়েছে। এবং '*ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হবে*' (গ), সেই অনুসারে যেইভাবে লেখা আছে, '*তোমার আলোতে আমরা দেখব আলো*' (ঘ) অর্থাৎ [পবিত্র] আত্মার আলোকীকরণ দ্বারা, সেই '*সত্যকার আলো যা জগতে আসা প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে*' (ঙ)। এইভাবে তিনি

নিজেতেই একমাত্র জনিতজনের গৌরব দেখান, ও সত্যকার উপাসকদের কাছে নিজেতে ঈশ্বরজ্ঞান প্রদান করেন (চ)। তাই ঈশ্বরজ্ঞান অভিমুখে যাত্রা একমাত্র আত্মা থেকে একমাত্র পুত্রের দ্বারা একমাত্র পিতার কাছে যায় (ছ)। অপরদিকে, স্বাভাবিক মঙ্গলময়তা ও প্রকৃতিগত পবিত্রতা ও রাজকীয় যোগ্যতা পিতা থেকে একমাত্র জনিতজনের দ্বারা আত্মার কাছে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে, পবিত্র মনার্খিয়া-ধর্মতত্ত্ব (জ) উপেক্ষা না করে হিপোস্তাসিস-ত্রয়কেও (ঝ) স্বীকার করা হয়। যারা মনে করে, 'প্রথম', 'দ্বিতীয়' ও 'তৃতীয়' বলায় সেই "উপগণনা" সার্থকতা অর্জন করে, তারা মেনে নিক, তারা খ্রিষ্টিয়ানদের অকলুষিত থেওলোগিয়ায় (ঞ) গ্রীক ভুল-জনিত বহু-ঈশ্বরবাদ অনুপ্রবেশ করে। কেননা "উপগণনার" জঘন্যতা কিছুই আনে না, কেবল প্রথম একজনকে, দ্বিতীয় একজনকে ও তৃতীয় একজনকে মেনে নিতে আনে। কিন্তু আমাদের জন্য প্রভুর জারীকৃত অনুক্রম (ট) যথেষ্ট; যে এ অনুক্রমটা উলট-পালট করে সে এদের অভক্তির চেয়ে কম গুরুতর অপরাধ করবে না। তাই, এরা যতই ভুলবশত কল্পনা করুক না কেন, "উপগণনার" এই প্রথার কারণে স্বরূপের সহভাগিতা আদৌ বিলীন হয় না, এবং এবিষয়ে যা বলা হয়েছে তা যথেষ্ট। কিন্তু এসো, একগুঁয়ে ও মূর্খ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে একমত হতে চেষ্টা করি, এবং এটা মেনে নিই যে, কোনও কিছুর যা দ্বিতীয়, তা সেটার "উপগণনার" ভিত্তিতেই দ্বিতীয় বলে অভিহিত (ঠ)। তবে এসো, দেখি এ ঘোষণা থেকে নির্গত ফলাফল কি। শাস্ত্রে বলে, *প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ, সেই প্রভু, স্বর্গ থেকে আগত* (ড), এবং অন্য একটা পদ বলে, *যা আত্মিক, তা প্রথম নয়, বরং যা প্রাণিক, তাই প্রথম; যা আত্মিক, তা পরেই আসে* (ঢ)। তাই যখন প্রথমটায় দ্বিতীয়টা "উপগণিত" করা হয় ও যা "উপগণিত" করা হয়েছে তাও তাতে "উপগণিত" করা হয়, তখন তোমাদের মতে এটা দাঁড়াবে যে, যা আত্মিক তা প্রাণিকটার চেয়ে কম সম্মানের যোগ্য হয় ও স্বর্গীয়জনও মৃন্ময়ের চেয়ে কম সম্মানের যোগ্য হন।

১৯শ অধ্যায়। যারা ঘোষণা করে, [পবিত্র] আত্মাকে গৌরবান্বিত করতে নেই, তাদের প্রতি প্রতিবাদ।

৪৮। এতে তারা বলে, 'তাই হোক; কিন্তু গৌরব [পবিত্র] আত্মায় আদৌ সেইভাবে আরোপণীয় নয়, যেভাবে তিনি আমাদের গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদে আমাদের দ্বারা উৎকীর্তিত।' যদি তাদের কাছে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সহভাগিতা [পবিত্র] আত্মার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ মনে না হয়, তাহলে, যিনি আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা অতিক্রম করেন, আমরা সেই [পবিত্র] আত্মার যোগ্যতার প্রমাণ কোথা থেকে নেব? তাঁর নামগুলোর অর্থের দিকে, তাঁর কর্মকাণ্ডের মহত্ত্বের দিকে, ও তিনি যে সমস্ত উপকার দিয়ে আমাদের এমনকি গোটা সৃষ্টিকে উপকৃত করে থাকেন সেই উপকারগুলোর দিকেও লক্ষ ক'রে এটা অবশ্যই সম্ভব যে, আমরা, অন্তত আমাদের সাধ্য অনুসারে, তাঁর স্বরূপের শ্রেষ্ঠতা ও তাঁর অগম্য পরাক্রম উপলব্ধি করতে পারব। [পবিত্র] আত্মা এভাবে অভিহিত: 'ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ' (ক), এবং 'আমাদের মুখমণ্ডলের শ্বাস সেই খ্রিষ্ট প্রভু' (খ), 'পবিত্র', যেইভাবে পিতাও পবিত্র ও পুত্রও পবিত্র। কেননা পবিত্রীকরণটা সৃষ্টিতে বাইরে থেকে প্রবেশ করানো হয়েছিল, কিন্তু [পবিত্র] আত্মা ক্ষেত্রে পবিত্রতা তাঁর স্বরূপের পূর্ণতার অংশ। সেজন্য তিনি পবিত্রীকৃত হন না, বরং পবিত্রতা-দানকারী। তিনি 'মঙ্গলময়' (গ) বলে অভিহিত যেইভাবে পিতাও মঙ্গলময় ও যিনি মঙ্গলময় থেকে জনিত তিনিও মঙ্গলময়; তিনি স্বকীয় সত্তা হিসাবেই মঙ্গলময়তার অধিকারী। তিনি 'ন্যায়শীল' (ঘ) বলে অভিহিত যেইভাবে 'প্রভু ঈশ্বর ন্যায়শীল' (ঙ), এই কারণে যে, তিনি নিজেই সত্য, তিনি নিজেই ন্যায়, ও নিজের সত্তার অপরিবর্তনশীলতা হেতু তিনি অন্য কিছুর দিকে বা কোনও দুর্বলতার দিকে বাঁকা কোন কিছুই জানেন না। সেই একমাত্র জনিতজনের মত তিনিও 'সহায়ক' বলে অভিহিত যেইভাবে প্রভু নিজে বলেন, *আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন* (চ)। এইভাবে পিতা ও পুত্র সংক্রান্ত যে নামগুলো, [পবিত্র] আত্মাও একই নামগুলোর অধিকারী, এবং তিনি স্বরূপে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলেই এ নামগুলো গ্রহণ করেন। আসলে সেই নামগুলো অন্য কোন্ উৎস থেকেই বা তাঁর কাছে আসতে পারত? তিনি 'রাজকীয়' (ছ), 'সত্যের আত্মা' (জ), 'প্রজ্ঞার আত্মা' (ঝ) বলেও অভিহিত; 'ঐশ্বরিক

আত্মাই আমাকে গড়েছেন’ (ঞ)। এবং শাস্ত্র এও বলে, *ঈশ্বর বেজালেলকে প্রজ্ঞা, সুবুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐশ্বরিক এক আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন* (ট)। সুতরাং, এগুলোই [পবিত্র আত্মার] সেই অসাধারণ ও মহৎ নামগুলো যা [যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন] তবু তাঁর গৌরব অতিক্রম করে না।

৪৯। তাঁর কর্মক্রিয়া কি? সেই কর্মক্রিয়া মহত্ত্বের জন্য অনির্বচনীয় ও সংখ্যার জন্য অগণন। যা যুগগুলোর পূর্ববর্তী, কেমন করে আমরা তা বুঝতে পারব? যুক্তিসম্পন্ন জীব অস্তিত্বশীল হওয়ার আগে তাঁর কর্মক্রিয়া কেমন ছিল? সৃষ্টির উপকারার্থে বর্ষিত তাঁর মঙ্গলদানগুলো কি? আগামী যুগগুলোতে তিনি কেমন পরাক্রম প্রকাশ করবেন? কেননা তিনি ছিলেন, পূর্বাস্তিত্বশীল ছিলেন, ও যুগগুলোর পূর্বে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সমঅস্তিত্বশীল ছিলেন। এর ফলে, যদিও তুমি এমন কিছু কল্পনা করবে যা যুগগুলোর পূর্ববর্তী, তবু তুমি দেখবে, তা [পবিত্র] আত্মার পরবর্তী। যদি সৃষ্টির কথা ভাব, তুমি দেখবে, আকাশমন্ডলের পরাক্রমগুলো [পবিত্র] আত্মা দ্বারা দৃঢ়স্থাপিত হয়েছিল; অবশ্যই এটা স্পষ্ট যে, এ দৃঢ়স্থাপনটা অমঙ্গল কাজ করার অসাধ্যতা বলেই অনুধাবনযোগ্য। ঈশ্বরের সঙ্গে সেইসব কিছুর গভীর ঘনিষ্ঠতা-সম্পর্ক, অমঙ্গলের দিকে ফেরার সেইসব কিছুর অসাধ্যতা, সুখে সেগুলোর স্থায়ী অবস্থান, এসবকিছু [পবিত্র] আত্মা থেকেই আকাশমণ্ডলের পরাক্রমসমুহের কাছে এল। খ্রিষ্টের আগমনের কথা ধর: [পবিত্র] আত্মাই সেটার অগ্রগামী। মাংসে খ্রিষ্টের আগমনের [অর্থাৎ, খ্রিষ্টের মাংসধারণের] কথা ধর: [পবিত্র] আত্মা তা থেকে অবিচ্ছেদ্য। যত পরাক্রম-কর্ম ও যত আরোগ্যদান পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই ঘটে। মন্দাত্মাগুলো ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে বিতাড়িত। [পবিত্র] আত্মার উপস্থিতিতে দিয়াবল শক্তিহীন হয়। পাপের ক্ষমা [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহে ঘটে। ‘*তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে ও পবিত্র আত্মায় ধৌত ও পবিত্রিত হয়েছ*’ (ক)। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলন [পবিত্র] আত্মা দ্বারাই ঘটে, কেননা ‘*ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, আব্বা, পিতা*’ (খ)। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান [পবিত্র] আত্মা দ্বারা ঘটে: ‘*তুমি তোমার আত্মাকে পাঠাবে, ও তারা সৃষ্ট হবে, এবং তুমি পৃথিবীর মুখ নবীভূত করবে*’ (গ)। যদি এই সৃষ্টিকে পরলোকগতদের জীবনে ফিরে আসা বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে যিনি

পুনরুত্থান থেকে জীবন বিতরণ করেন ও আমাদের প্রাণ এই আত্মিক জীবনের জন্য উপযোগী করেন, সেই [পবিত্র] আত্মার কর্মক্রিয়া কেমন মহৎ। যদি সৃষ্টিকে পাপে পতিত মানুষদের এমন শ্রেয়তর অবস্থায় রূপান্তর বলে ধরে নেওয়া হয় যা এই নিম্নলোকে ঘটে—কেননা শাস্ত্রের প্রচলিত রচনা-শৈলী অনুসারে সৃষ্টি ঠিক তাই বিবেচিত যেইভাবে পল বলেন, *কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি* (ঘ)—তাহলে যে নবীকরণ এইখানে ঘটে ও [পবিত্র] আত্মার মধ্য দিয়ে আগত স্বর্গীয় নাগরিকত্বে এই পার্থিব ও ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ জীবনের যে পরিবর্তন, তা আমাদের প্রাণকে বিস্ময়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উত্তোলিত করে। তবে কি, [পবিত্র আত্মাকে] অতিরিক্ত সম্মান আরোপ করায় এসব কিছুতে তাঁর যোগ্যতার সীমা অতিক্রম করছি বলে ভয় করতে হয়? নাকি, এর বিপরীতে, তাঁর বিষয়ে আমরা যা ভাবি, তখনও তা কমাচ্ছি বলে ভয় করা উচিত যখন আমাদের ধারণায় আমরা মানব মন ও ভাষার কল্পিত সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করছি? পবিত্র আত্মাই একথা বলছেন, যেইভাবে প্রভু বলেন, *ওঠ, নিচে নাম, দ্বিধা না করে তাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি* (ঙ)। একথা কি নিম্নাবস্থার এমন মানুষের কথা যে ভয়ে আতঙ্কিত? ‘*আমি বার্নাবাস ও শৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে আমার জন্য তাদের স্বতন্ত্র করে রাখ*’ (চ)। একটা দাস কি এধরনের কথা বলত? আরও, ‘*প্রভু তাঁর আত্মা সহ আমাকে প্রেরণ করেছেন*’ (ছ) এবং ‘*আত্মা প্রভু থেকে নেমে এসে তাদের চালনা করেছেন*’ (জ)। এবং তুমি যেন তাঁর পরিচালনা নিম্নধরনের সেবাকর্ম বলে জ্ঞান না কর। কেননা সেই পরিচালনা যে ঈশ্বরের একটা কর্মক্রিয়াও, তা স্বয়ং লোগোস-বাণী এ বলে ঘোষণা করেন, *তুমি তোমার আপন জাতিকে চালনা করলে মেষপালেরই মত* (ঝ) ও *তুমি যোসেফকে মেষের মত চালনা কর* (ঞ), আরও, *তিনি তাদের ভরসা ভরে নিয়ে চললেন, ফলে তারা কিছুই ভয় করল না* (ট)। তাই, যখন তুমি শুনবে, ‘সেই সহায়ক যখন আসবেন, তিনিই তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন ও পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন’ (ঠ), তখন ধারণাটা উল্টিয়ে না দিয়ে সেই পরিচালনা সেইভাবে বোঝ যেভাবে তা বুঝতে তোমাকে শেখানো হয়েছে।

৫০। কিন্তু ধন্য পল একথাও বলেন, *তিনি আমাদের হয়েও অনুরোধ করেন* (ক)। আহা, তবে যে অনুরোধ করে সে যেমন উপকর্তার চেয়ে নিচে রয়েছে, তেমনি [পবিত্র] আত্মাও যোগ্যতায় ঈশ্বরের চেয়ে নিম্নপদস্থ। তাই তুমি কি সেই একমাত্র জনিতজনের বিষয়ে একথা কখনও শোননি, *তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন?* (খ)। কিন্তু যেহেতু [পবিত্র] আত্মা তোমাতে রয়েছেন—যদি তিনি সত্যিকারে তোমাতে বিদ্যমান—ও যেহেতু আমাদের যে কি উপকারে আসে তেমন সিদ্ধান্তে অন্ধ করা এই আমাদের তিনি শিক্ষা দেন ও চালনা করেন, সেজন্য এমনটা না হোক যে তাঁর বিষয়ে তোমার ভক্তিময় ও পবিত্র ধারণায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হও। কেননা মানুষের প্রতি উপকর্তার মঙ্গলময়তা যে অকৃতজ্ঞতার সুযোগ হবে, তা সত্যিই হত অকৃতজ্ঞতার আতিশয্য। ‘*পবিত্র আত্মাকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না*’ (গ)। সাক্ষ্যমরদের প্রথমফসলই যেন নিবেদিত সেই স্তেফান যখন জনগণকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ বিষয়ে নিন্দা করেন, তখন তিনি যা বলেন তা শোন; তিনি বলেন, *তোমরা সবসময় পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করে থাক* (ঘ)। ইশাইয়াও বলেন, *তারা পবিত্র আত্মাকে অতিষ্ঠ করল; তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা স্বরূপ হলেন* (ঙ)। আরও, *যাকোবকুল প্রভুর আত্মাকে ক্রুদ্ধ করল* (চ)। এসমস্ত বচন কি অধিকারসম্পন্ন পরাক্রমের চিহ্ন নয়? যারা এসমস্ত বচন শোনে, তাদের যে কেমন ধারণায় উপনীত হওয়া উচিত, তা আমি পাঠকদের বিচারে রাখি। এ বচনগুলো এমন কি যা একটা যন্ত্রের বিষয়ে বলা যেতে পারে? অথবা, বচনগুলো এমন কি যা পরের বশীভূত এক ব্যক্তি বিষয়ে বলা যেতে পারে? অথবা, বচনগুলো এমন কি এমন ব্যক্তি বিষয়ে বলা যেতে পারে যে সৃষ্টজীবের সমযোগ্যতার অধিকারী ও আমাদের মত দাস? তেমন ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা যে মুখেও মাত্র ভক্তপ্রাণদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে, এটাই বরং কি গুরুতর ব্যাপার নয়? তুমি কি ঘোষণা করছ, [পবিত্র] আত্মা দাস মাত্র? অথচ প্রভু বলেন, *দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না* (ছ), কিন্তু [পবিত্র] আত্মা ঈশ্বরের বিষয় ঠিক সেইভাবে জানেন যেভাবে মানুষের [পবিত্র] আত্মা মানুষের অন্তরের কথা জানে (জ)।

২০শ অধ্যায়। যারা ঘোষণা করে, [পবিত্র] আত্মার অবস্থা দাসের অবস্থা বা প্রভুর অবস্থা নয়, বরং তাঁর অবস্থা স্বাধীন অবস্থা; তাদের প্রতি প্রতিবাদ।

৫১। তারা নাকি বলে, পবিত্র আত্মা দাসও নন, প্রভুও নন; কিন্তু স্বাধীন। তেমন কথা যে বলে, আহা, তার কেমন ভয়ঙ্কর বোধহীনতা ও দুর্ভাগা দুঃসাহস। আমি তাদের অজ্ঞতার জন্য, না কি তাদের ঈশ্বরনিন্দার জন্য বেশি বিলাপ করব? তারা তো মানব উদাহরণ হাতিয়ার করে ঐশ্বরিক রহস্যকে অমর্যাদা করে ও সেই অনির্বচনীয় ঐশ্বরিক স্বরূপকে এই নিম্নলোকের অভ্যাস উপযোগী করতে চেষ্টা করে যা যোগ্যতার পরিবর্তনশীল পার্থক্য লক্ষ করে, একথা না ভেবে যে, মানুষদের মধ্যে কেউই স্বরূপে দাস নয়। কেননা অত্যাচারিত যারা, হয় তারা দাসত্বের জোয়ালের অধীনে পতিত হল যেইভাবে ঘটে যুদ্ধের বন্দিদশা ক্ষেত্রে; না হয় দরিদ্রতার কারণে তাদের দাস করা হয় যেইভাবে মিশরীয়েরা ফারাও দ্বারা অত্যাচারিত ছিল; না হয় প্রজ্ঞাময় ও গুপ্ত ব্যবস্থা ক্রমে পিতার আদেশ ক্রমে কম প্রতিভাসম্পন্ন পুত্রদের বেশি বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন পুত্রদের সেবা করতে বাধ্য করা হয়েছে; অবস্থা এমন যা ন্যায়বান পরীক্ষক দণ্ড নয় বরং উপকার বলে গণ্য করবে। কেননা সুবুদ্ধির অভাবে স্বভাবে যার আত্মশাসন করার ক্ষমতা নেই, তার পক্ষে অপর একজনের সম্পদ হওয়া বেশি উপকারী, যাতে তার শাসকের যুক্তি দ্বারা চালিত হয়ে সে নিজের চালক বেছে নিয়েছে এমন রথের মত হয় ও চালনার জন্য বসা কর্ণধারের অধিকারী জাহাজের মত হয়। এজন্য যাকোব পিতার আশীর্বাদ দ্বারা এসৌর প্রভু বলে নিযুক্ত হলেন (ক), যাতে করে নিজের অনিচ্ছায়ও মূর্খ প্রজ্ঞাবান দ্বারা উপকৃত হয় যেহেতু নিজেকে সুস্থির করার মত তার বুদ্ধি নেই। এবং '*কানান নিজের ভাইদের দাসানুদাস হবে*' (খ), কারণ সে সদ্‌গুণ বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল না ও তার পিতা ছিলেন একজন নির্বোধ মানুষ। এই যে, এইভাবেই মানুষ দাস হয়। কিন্তু তারাই স্বাধীন, যারা দরিদ্রতা বা যুদ্ধ এড়ায় অথবা পরের সেবা-যত্নের যাদের দরকার হয় না। এর ফলে, যদিও একে প্রভু ও ওকে ভৃত্য বলা হয়, তবু বাস্তব ক্ষেত্রে, একে অন্যের প্রতি আমাদের যে সমান সম্মান দেয়, তার জন্য, ও যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমরা যে তাঁর অধিকার, এর জন্য, আমরা সবাই সমানভাবে দাস। এদিক দিয়ে, তুমি কাকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পার? আমরা যে সৃষ্টজীব, ঠিক এই

কারণেই আমরা দাসত্ব-অবস্থায় স্থিত। কেননা স্বর্গীয় সৃষ্টপ্রাণী একে অন্যকে শাসন করেন না, কারণ তাঁরা অভিলাষ-চালিত নন ও প্রভু হিসাবে ঈশ্বরকে দেয় মর্যাদা ও স্রষ্টা হিসাবে তাঁকে দেয় গৌরব আরোপ ক'রে সকলে তাঁর সামনে প্রণত থাকেন। *'কেননা পুত্র নিজ পিতাকে ও দাস নিজ প্রভুকে গৌরব আরোপ করে'* (গ)। ঈশ্বর উভয় জিনিস দাবি করেন: তিনি বলেন, *আমি যদি পিতা হই, তবে আমার দেয় গৌরব কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমার দেয় সম্ভ্রম কোথায়?* (ঘ)। অন্যদিকে, যে জীবন প্রভুর দৃষ্টিতে যাপিত হত না, সেই জীবন যত জীবনের চেয়ে অভাগা জীবন হত। অতি গর্বের কারণে যে বিদ্রোহী [স্বর্গীয়] পরাক্রমগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বশ্যতার বিষয়ে বিদ্রোহ করেছিল, তারা যে অন্য অবস্থায় জন্ম নিয়েছিল, তার জন্য নয়, কিন্তু স্রষ্টার প্রতি অবাধ্যতার কারণেই তাদের [পতিতদের যোগ্য] সেই দশা ভোগ করতে হল। তাই তুমি কাকে স্বাধীন ঘোষণা কর? যার্ কোন রাজা নেই, সেই কি? অন্যের উপরে প্রভুত্ব করার যার অধিকার নেই ও নিজের উপরে পরের প্রভুত্ব মানে না, সেই কি? কিন্তু জীবদের মধ্যে সেধরনের প্রকৃতি তো নেই, ও তেমন কথা [পবিত্র] আত্মা ক্ষেত্রে কল্পনা করা তো অভক্তি স্বরূপ। তাই, তিনি সৃষ্ট হলে তবে অন্যান্য যত বস্তুর মত তিনি অবশ্যই দাস। কেননা সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *সবকিছুই তোমার দাস* (ঙ)। অপরদিকে, তিনি সৃষ্টির ঊর্ধ্বে বিরাজমান হলে তবে তিনি রাজমর্যাদার অংশী।

২১শ অধ্যায়। [পবিত্র] আত্মাকে প্রভু নাম আরোপিত: এবিষয়ে শাস্ত্রের সাক্ষ্যবাণী।

৫২। যোগ্যতর বিষয়গুলো উপস্থাপনে [আমাদের ধর্মতত্ত্বের] গৌরবের শ্রেষ্ঠতা যে তর্কাতীত, তা প্রমাণ করা যখন সম্ভব, তখন আমাদের ধর্মতত্ত্বের পক্ষে, অযোগ্য বিষয়গুলো উপস্থাপনে অসম্মানজনক ভাবে জয় করার কি দরকার আছে? শাস্ত্র আমাদের যা শেখায়, আমরা যদি তা বলতাম, তাহলে প্রত্যেক প্নেউমাতোমাখীয় [তথা পবিত্র আত্মার বিরোধী যোদ্ধারা] সাথে সাথে উচ্চ ও তীব্র চিৎকার উত্তোলন করত ও কান বন্ধ করে পাথর বা হাতে যাই ধরা যেতে পারত না কেন তা অস্ত্র হিসাবে ধরে আমাদের বিরুদ্ধে ছুটে আসত। কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে সত্যের স্থানে রাখা উচিত নয়। কেননা

প্রেরিতদূতের কাছে আমরা একথা পেয়েছি, ‘*প্রভু তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের ভালবাসার দিকে ও ক্লেশের মধ্যে খ্রিষ্টের সহিষ্ণুতার দিকে চালিত করুন*’ (ক)। ক্লেশের মধ্যে যিনি ঈশ্বরের ভালবাসার দিকে ও খ্রিষ্টের সহিষ্ণুতার দিকে চালিত করেন, সেই প্রভু কে? যারা [পবিত্র] আত্মাকে দাস করে তোলে, তারাই আমাদের উত্তর দিক। কেননা বচনটা যদি পিতা ঈশ্বরকে লক্ষ করত, তাহলে বচনটা এমনিই বলত, ‘প্রভু নিজের ভালবাসার দিকে তোমাদের চালিত করুন’; অন্যদিকে যদি বচনটা পুত্রকে লক্ষ করত, তাহলে বচনটা ‘তাঁর নিজের সহিষ্ণুতার দিকে’ যোগ করত। তাই তারা অনুসন্ধান করুক অন্য কোন্ ‘প্রসোপোন’ [πρόσωπον - ব্যক্তি] আছেন যিনি ‘প্রভু’ নামে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য। এটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটা ঘোষণা রয়েছে যা অন্য একটা পদে উল্লিখিত, ‘*প্রভু করুন, পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে উঠে উপচে পড়ে, তোমাদের প্রতি আমাদের ভালবাসাও যেমনটি উপচে পড়ে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যখন তাঁর সকল পবিত্রজনের সঙ্গে আসবেন, তখন তিনি যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন*’ (খ)। আমাদের পিতা ঈশ্বরের সামনে কোন্ প্রভু এমনটা মিনতি করেন যেন আমাদের প্রভুর আগমনে যাদের হৃদয় পবিত্রতায় দৃঢ় ও অনিন্দনীয় করা হয়েছে, থেসালোনিকির সেই বিশ্বস্তদের [তথা ভক্তদের] হৃদয় দৃঢ়ীকৃত হয়? যারা পবিত্র আত্মাকে কোন কাজের জন্য প্রেরিত এমন ভৃত্য-আত্মাগুলোর স্থান দেয়, তারাই আমাদের উত্তর দিক। তাই তারা আরও একটা সাক্ষ্যবাণী শুনুক যা ‘প্রভু’ নামটা [পবিত্র] আত্মাকে স্পষ্টভাবেই আরোপ করে: ধন্য পল বলেন, ‘*প্রভুই সেই আত্মা*’, এবং ‘*প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে*’ (গ)। তর্কাতর্কির কোনও অজুহাত না রাখার লক্ষ্যে আমি প্রেরিতদূতের আসল বাণী উপস্থাপন করব, ‘*আজ পর্যন্ত পুরাতন নিয়ম পাঠ করার সময়ে সেই আবরণ থেকে যাচ্ছে, তা সরানো যাচ্ছে না, কেননা সেই আবরণ খ্রিষ্টেই লোপ পায়; কিন্তু তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে। প্রভুই সেই আত্মা*’ (ঘ)। তিনি কেন এ কথা বলছেন? কারণ যে কেউ অক্ষরের নগ্ন অর্থে বসে থাকে ও বিধানের নির্দেশাবলিতে ব্যস্ত থাকে, অক্ষরের ইহুদীয় পালনের কারণে তার হৃদয় কেমন যেন একটা আবরণে ঢাকা। এবং এটা এজন্য হয় যে, সে এটা জানে না যে খ্রিষ্টের আগমনে বিধানের দৈহিক পালন

বাতিল, কারণ পূর্বচিহ্নগুলো বাস্তবতায় রূপান্তরিত হলো। সূর্যের আবির্ভাবে বাতি নিষ্প্রয়োজন হয় এবং বিধান আর কোন উপকারিতা রাখে না, সত্য প্রকাশ পেলে ভাববাণী নীরব হয়। কিন্তু যে কেউ বিধানের অর্থের গভীরতায় লক্ষ করতে পেরেছে, এবং অক্ষরের অন্ধকার একটা আবরণই যেন সরিয়ে দেবার পর রহস্যগুলোতে প্রবেশ করতে পেরেছে, সে সেই মোশির অনুকরণ করেছে যিনি অক্ষর থেকে আত্মার দিকে ফিরে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সময়ে আবরণটা খুলে দিতেন [ঙ]। কেননা বিধানের নির্দেশনার অন্ধকার মোশির মুখমণ্ডলের উপরে সেই নামানো আবরণের অনুরূপ, কিন্তু আত্মিক দর্শন প্রভুর দিকে ফেরার অনুরূপ। তাই, যে কেউ বিধান পাঠে আবরণটা সরিয়ে দিয়েছে, সে প্রভুর দিকে ফিরে রয়েছে—কিন্তু এখন আত্মাই 'প্রভু' বলে অভিহিত—এবং সে সেই মোশির মত হয় ঈশ্বরের আবির্ভাবের জন্য যাঁর মুখমণ্ডল গৌরবে দীপ্তিময় ছিল। কেননা, উজ্জ্বল রঙের কাছাকাছি স্থিত জিনিস যেমন সেই উজ্জ্বলতা থেকে নিঃসৃত বিভার রঙে রঙ্গিন হয়, তেমনি যে নিজের চোখ [পবিত্র] আত্মায় স্বচ্ছভাবে নিবদ্ধ রাখে, সেও তাঁর গৌরব দ্বারা কেমন যেন আরও দীপ্তিময় কিছুতেই রূপান্তরিত হয় যেহেতু সে নিজের হৃদয়ে [পবিত্র] আত্মা থেকে নিঃসৃত সত্য দ্বারা, একটা আলো দ্বারাই যেন, আলোকিত হয়। এটাই হলো '*[পবিত্র] আত্মার গৌরব থেকে তাঁর নিজের গৌরবে রূপান্তরিত হওয়া*' [চ], কার্পণ্য অনুসারে নয়, ক্ষীণভাবেও নয়, কিন্তু এমন পর্যায়ে আলোকিত যা ধারণ করতে সেই সক্ষম যে [পবিত্র] আত্মা দ্বারা আলোকিত। '*তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন*' [ছ] : হে মানুষ, প্রেরিতদূত যে একথা বলেন, তাতে তুমি কি ভীত হও না? তিনি কি একটা দাসের নিবাস 'মন্দির' নামে সম্মানিত করতে সম্মত হতেন? যে শাস্ত্র পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখা হয়েছিল বিধায় সেই শাস্ত্রকে যিনি 'ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত' বলে অভিহিত করেন, তিনি কেনই বা এমন কথা ব্যবহার করবেন যা তাঁকে অপমান করবে ও তাঁকে ছোট করবে?

২২শ অধ্যায়। **পিতা ও পুত্রের মত [পবিত্র] আত্মাকে দর্শন করা কঠিন। এ থেকে তাঁদের স্বরূপগত সহভাগিতা প্রমাণিত।**

৫৩। [পবিত্র] আত্মাকে যে [পিতা ও পুত্রের] একই উপাধিসমূহ আরোপিত ও পিতা ও পুত্রের সঙ্গে যে কর্মক্রিয়া ক্ষেত্রে তাঁর একটা সহভাগিতা রয়েছে, শুধু এ থেকেই যে তাঁর স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব চেনা যেতে পারে তা নয়, কিন্তু এজন্যই তাঁর স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব চেনা যেতে পারে যে, দর্শনে তাঁকে অনুভব করাও একইভাবে কঠিন। পিতা বিষয়ে যা বলা হয় তথা পিতা মানব ধারণার অতীত, এবং পুত্র বিষয়ে যা বলা হয়, প্রভু সেই একই কথা পবিত্র আত্মা সম্পর্কেও বলেন: *হে ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানেনি* (ক): 'জগৎ' বলতে এখানে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নিয়ে গঠিত সেই সমস্ত কিছু বোঝায় না, কিন্তু অসীম পরিবর্তনের বশীভূত ও ক্ষীণ এজীবনকে বোঝায়। এবং নিজের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, *আর অল্পকাল, পরে জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে* (খ)। তিনি এখানেও 'জগৎ' তাদেরই বলেন যারা জড় ও মাংসময় জীবনের সঙ্গে জড়িত ও কেবল নিজেদের চোখ দিয়ে সত্যকে বিচার করে, কিন্তু পুনরুত্থানে তাদের বিশ্বাসের অভাবের কারণে তারা মনশ্চক্ষু দিয়ে আমাদের প্রভুকে দেখতে পারবে না। তিনি [পবিত্র] আত্মা সম্পর্কেও একই কথা বলেছেন, *তিনি সেই সত্যের আত্মাকেই দেবেন, জগৎ যাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না* (গ)। যার মন দর্শন করতে অভ্যস্ত নয়, যে মানুষ নিজের মনকে মাংসের গতিতে কাদায়ই যেন একেবারে নিমজ্জিত অবস্থায় বহন করে, সেই মাংসময় মানুষ সত্যের আত্মিক আলোর দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করতে পারে না। এজন্য জগৎ তথা মাংসের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বশীভূত এজীবন অর্পিত [পবিত্র] আত্মাকে গ্রহণ করে না, যেইভাবে অসুস্থ চোখ সূর্যের রশ্মির আলো গ্রহণ করে না। কিন্তু, যিনি নিজের শিষ্যদের বিষয়ে এটা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর দেওয়া শিক্ষা গুণে তাঁদের জীবন পরিশুদ্ধ হয়েছে, তাঁর সেই শিষ্যদের প্রভু [পবিত্র] আত্মার রহস্য দর্শন করার ও তাতে প্রবেশ করার ক্ষমতা মঞ্জুর করেন। তিনি বলেন, *আমি যে বাণী তোমাদের শুনিয়েছি, সেই বাণী গুণে তোমরা এর মধ্যে পরিশুদ্ধ হয়েছ* (ঘ)। জগৎ এজন্যই পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তাঁকে দেখতে পায় না: কিন্তু '*তোমরা তাঁকে জান, কারণ*

তিনি তোমাদের কাছে কাছে থাকেন’ [ঙ]। ইশাইয়াও একই কথা বলেন, ‘যিনি পৃথিবীকে ও তা থেকে যা কিছু উৎপন্ন পিটিয়ে পিটিয়ে তা পেতে দিয়েছেন, যিনি পৃথিবীর বাসিন্দাদের শ্বাস দিয়েছেন ও পৃথিবীর উপরে যা কিছু হাঁটে, তাকে আত্মা দান করেছেন, [ইত্যাদি] [চ]। যারা পৃথিবীর জিনিসের মধ্যে হেঁটে বেড়িয়ে সেগুলোর উপরে নিজেদের উত্তোলিত করে, তারা পবিত্র আত্মার যোগ্য বলে ঘোষিত। সুতরাং, জগৎ যাঁকে ধারণ করতে পারে না ও কেবল পবিত্রজনেরাই নিজেদের হৃদয়ের শুদ্ধতা গুণে যাঁকে দর্শন করতে পারে, তাঁর বিষয়ে কী ভাবা উচিত? অথবা, তাঁর কেমন দেয় সম্মান পর্যাপ্ত বলে গণ্য?

২৩শ অধ্যায়। [পবিত্র] আত্মার বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণীর মাধ্যমেই পবিত্র আত্মাকে গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ।

৫৪। অন্যান্য পরাক্রম ক্ষেত্রে এটা মেনে নেওয়া হয় যে, সেই পরাক্রম সীমাবদ্ধ স্থানে স্থিত। যে দূত কর্নেলিউসের পাশে ছিলেন, তিনি একই সময়ে ফিলিপের পাশে ছিলেন না [ক], এবং যে দূত বেদি থেকে জাখারিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি একই সময়ে স্বর্গে নিজের স্থান দখল করছিলেন না [খ]। অন্যদিকে, [পবিত্র] আত্মা ক্ষেত্রে এমনটা মেনে নেওয়া হয়, তিনি একই সময়ে হাবাকুকে ও বাবিলনে দানিয়েলে কর্মরত [গ], এবং তিনি যেরেমিয়ার সঙ্গে কারাগারে আছেন [ঘ] ও এজেকিয়েলের সঙ্গে কেবার নদীর ধারে আছেন [ঙ]। কেননা *‘বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ’* [চ], এবং *‘তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব?’* [ছ]। এবং নবী বলেন, *যেহেতু আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, প্রভুর উক্তি, সেজন্য আমার আত্মা তোমাদের মাঝে উপস্থিত* [জ]। তাই, যিনি সর্বত্র বিদ্যমান ও ঈশ্বরের সঙ্গে থাকেন, তাঁকে কোন্ স্বরূপের অধিকারী ভাবা উচিত? যে স্বরূপ সবকিছু ধারণ করে আছে তিনি কি সেটারই অধিকারী? নাকি, শাস্ত্র যেভাবে স্বর্গদূতদের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বরূপ দেখাল, তিনি ঠিক সেই স্বরূপেরই অধিকারী যা নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে সীমাবদ্ধ? কিন্তু কেউই তেমন কথা বলবে না। তবে, যিনি স্বরূপে ঐশ্বরিক [ঝ], মহত্ত্বে অসীম, কর্মকাণ্ডে পরাক্রমী, উপকার দানে মঙ্গলময়, আমরা কি তাঁকে উৎকীর্তিত ও

গৌরবান্বিত করব না? আমি মনে করি, তাঁকে গৌরব আরোপ করা তাঁর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের বিবরণী দেওয়ায় ছাড়া অন্য কিছুতেই সার্থকতা অর্জন করে না। তবে, হয় এরা [পবিত্র] আত্মার মঞ্জুর করা উপকারগুলো স্মরণ করায় আমাদের বাধা দেবে, না হয় তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যক্ত করা আপনা আপনিই হলো মহত্তম প্রশংসার সিদ্ধি। কেননা আমাদের পক্ষে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা ঈশ্বরকে ও তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে কেবল এই ভাবেই গৌরবান্বিত করা উচিত, তথা, আমাদের সাধ্যমত তাঁর বিস্ময়কর কর্মকীর্তির বিবরণ দেওয়ার মাধ্যমে।

২৪শ অধ্যায়। সৃষ্টিকর্মে যা গৌরবান্বিত, তার সঙ্গে তুলনা থেকে তাদের অযৌক্তিকতাকে প্রতিবাদ যারা [পবিত্র] আত্মাকে গৌরবান্বিত করে না।

৫৫। তাছাড়া, মানুষ হিসাবে মানুষও *'গৌরব ও সম্মানের মুকুটে পরিবৃত'* (ক) ও *'যে কেউ সৎকর্ম করে, তার জন্য গৌরব, সম্মান ও শান্তি'* (খ) প্রতিশ্রুত। যে ইস্রায়েল দত্তকপুত্রত্ব, গৌরব ও উপাসনা-রীতির অধিকারী (গ), সেই ইস্রায়েলের বিশেষ একটা গৌরবও আছে। সামসঙ্গীত-রচয়িতা তাঁর নিজস্ব একটা গৌরবের কথা বলে: *আমার গৌরব নিরন্তর করবে তোমার স্তুতিগান* (ঘ), এবং, *'ওঠ, আমার গৌরব'* (ঙ)। তাছাড়া সূর্য, চাঁদ ও তারাগুলোরও একটা গৌরব আছে (চ); প্রেরিতদূত অনুসারে *'দণ্ডের সেবা-পদও গৌরবময় হল'* (ছ)। তাই, যখন সবকিছুর জন্য স্বীয় স্বীয় একটা গৌরব আছে, তখন তুমি কি চাও, সমস্ত জীবদের মধ্যে কেবল [পবিত্র] আত্মাই অগৌরবান্বিত অবস্থায় থাকবেন? প্রকৃতপক্ষে প্রেরিতদূত বলেন, *'[পবিত্র] আত্মার সেবাকর্ম গৌরবেই মণ্ডিত'* (জ)। সামসঙ্গীত-রচয়িতা অনুসারে, ধার্মিক মানুষের গৌরবও মহৎ। অথচ [হে ভ্রান্তমতপন্থী,] তোমার মতে কি [পবিত্র] আত্মার গৌরব বলতে কিছু নেই? তবে যে ঝুঁকির বশে আমরা তেমন ধারণা দ্বারা নিজেদের সেই পাপে উপনীত হতে দিতে পারি যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয় (ঝ), সেই ঝুঁকি কি স্পষ্ট নয়? যে মানুষ নিজের কর্মের ধর্মময়তা গুণে পরিত্রাণ পায়, যারা প্রভুকে ভয় করে, যখন সেই মানুষ তাদের গৌরবান্বিত করে, তখন সেই মানুষ যে [পবিত্র] আত্মাকে তাঁর দেয় গৌরব থেকে বঞ্চিত করবে তা দূরের কথা। তবে তারা তা মেনে নেয়: হ্যাঁ, তিনিও গৌরবান্বিত হোন, কিন্তু

পিতা ও পুত্রের সঙ্গে নয়। এবং [পবিত্র] আত্মার জন্য অন্য স্থান কল্পনা করা ও প্রভুর স্থিরীকৃত স্থান ত্যাগ করার কি দরকার আছে? এবং যিনি বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে, আমাদের মুক্তির বাপ্তিস্মে, পরাক্রম-কর্ম সাধনে, পবিত্রজনদের অন্তরে বসবাসে, যারা তাঁর কথা শোনে তাদের উপরে সমস্ত অনুগ্রহ বর্ষণে ঈশ্বরত্বের সঙ্গে একেবারে মিলিত, তাঁর কাছ থেকে সেই গৌরবের সহভাগিতা কেড়ে নেওয়া কি দরকার আছে? কেননা পবিত্র আত্মাকে ছাড়া সৃষ্টজীবের কাছে কোন দান আসে না, যেহেতু আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভুর কাছ থেকে আমরা সুসমাচারে [ঞ] এটা শিখি যে, পবিত্র আত্মা সহযোগী না হলে খ্রিষ্টের পক্ষে একটামাত্র কথা উচ্চারণ করাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তো জানি না, পবিত্র আত্মার অংশভাগী [ট] হয়েছে যে মানুষ, সে এতে একমত হবে যে, এসব কিছু উপেক্ষা ক'রে ও সকলের সঙ্গে সহভাগিতা ভুলে গিয়ে তাঁকে পিতা ও পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা হোক। তাই আমরা তাঁকে কোন্ অনুক্রমে স্থান দেব? সৃষ্টির অনুক্রমে কি? কিন্তু সৃষ্টি, গোটাই সৃষ্টি দাসত্ব অবস্থায়ই রয়েছে, কিন্তু [পবিত্র] আত্মা স্বাধীন করে তোলেন: *'যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা'* [ঠ]। সৃষ্ট নানা স্বরূপের মধ্যে পবিত্র আত্মাকে উল্লিখিত করা যে উচিত নয়, সেসম্পর্কে এখনও বহু কথা বলার রয়েছে বিধায় আমি আপাতত সেবিষয় স্থগিত করতে যাচ্ছি। কেননা, ব্যাপারটার গুরুত্ব ধরে যদি আমাদের পক্ষে নিজস্ব প্রমাণ উপস্থাপন করা ও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের আপত্তি প্রতিরোধ করা দরকার হত, তাহলে দীর্ঘ আলোচনা দেওয়া দরকার হত এবং পুস্তকের নিষ্প্রয়োজন দৈর্ঘ্যের কারণে আমাদের পাঠকদের শ্রান্ত করে দিতাম। অতএব, সেবিষয়ে আলাদা আলোচনা সংরক্ষিত ক'রে, এসো, বর্তমান আলোচনায় লেগে থাকি।

৫৬। তবে এসো, এক একটা বিষয় এককভাবে পরীক্ষা করি। [পবিত্র] আত্মা স্বরূপে মঙ্গলময় যেইভাবে পিতা মঙ্গলময় ও পুত্র মঙ্গলময়। অন্যদিকে সৃষ্টজীব মঙ্গল বেছে নেওয়ার ফলেই মঙ্গলের অংশী হয়। [পবিত্র] আত্মা ঈশ্বরের গভীরতা জানেন: অন্যদিকে সৃষ্টজীব [পবিত্র] আত্মার মধ্য দিয়েই রহস্যগুলোর প্রকাশ গ্রহণ করে। [পবিত্র] আত্মা সেই ঈশ্বরের সঙ্গে সঞ্জীবিত করেন যিনি সবকিছু জীবনে জনিত করেন, সেই পুত্রের সঙ্গে যিনি জীবন দান করেন। প্রেরিতদূত বলেন, *যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা*

তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন (ক)। আরও, '*আমার মেষগুলো আমার কণ্ঠে কান দেয়, এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি*' (খ)। কিন্তু শাস্ত্রে এও বলে, *আত্মাই জীবনদায়ী* (গ); আরও বলে, *ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন* (ঘ)। প্রভুও এমনটা ঘোষণা করেন যে, আত্মাই জীবনদায়ী: '*মাংস কোন কাজের নয়*' (ঙ)। তাই যে প্রকৃতির পক্ষে জীবন পাওয়া দরকার, [পবিত্র] আত্মাকে সেই প্রকৃতির অংশ করার জন্য আমরা কেমন করে জীবন দান করা থেকে [পবিত্র] আত্মাকে বঞ্চিত করব? কে এত তর্কপ্রিয়, স্বর্গীয় দানের প্রতি কে এত পরকীয়, কে ঈশ্বরের সুন্দর বাণী শ্বাদ করতে অক্ষম ও অনন্ত প্রত্যাশা বিহীন যে [পবিত্র] আত্মাকে ঈশ্বরত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করবে ও তাঁকে সৃষ্টির পর্যায়ে স্থান দেবে?

৫৭। তারা নাকি বলে, আমাদের মধ্যে [পবিত্র] আত্মা ঈশ্বর থেকে আগত দানের মত। আচ্ছা, দাতাকে যে সম্মান আরোপ করা হয়, দানকে সেই একই সম্মানে সম্মানিত করা হয় না। অবশ্যই [পবিত্র] আত্মা ঈশ্বরের দান, কিন্তু এমন দান যা জীবনদায়ী। প্রেরিতদূত বলেন, *জীবনদায়ী সেই আত্মার বিধান তোমাদের মুক্ত করে দিয়েছে* (ক); তিনি এমন দান যা পরাক্রমও দান করে, '*তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন*' (খ)। এমনটা কি হতে পারে যে এজন্যই তাঁকে অবজ্ঞা করতে হবে? তবে পুত্রকেও কি মানুষদের কাছে দান করা হয়নি? পল বলেন, *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* (গ)। এবং মনুষ্যত্বধারণ (ঘ) রহস্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি অন্য এক পদে বলেন, *[ঈশ্বর এমনটা করেছিলেন যাতে] ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি* (ঙ)। এইভাবে, যারা এসমস্ত কথা বলে, যেহেতু ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার প্রকাশকেই ঈশ্বরনিন্দার অজুহাত হিসাবে ধরে, সেজন্য তারা কি সেই ইহুদীদের অকৃতজ্ঞতা অতিক্রম করে না? তারা নাকি [পবিত্র] আত্মাকে দোষারোপ করে কারণ তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকবার স্বাধীনতা আমাদের দান করেছেন: *ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা'* (চ) যাতে তাঁর কণ্ঠ তারই কণ্ঠ হয় যে তাঁকে গ্রহণ করেছে।

২৫শ অধ্যায়। **শাস্ত্র "সঙ্গে" নয়, "মধ্যেই" ব্যবহার করে যা "সঙ্গে"র একই অর্থ বহন করে।**

৫৮। তারা আরও বলে, কেন এমন কোনও স্থান নেই যেখানে শাস্ত্র শিক্ষা দেয়, [পবিত্র] আত্মা পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সহ-গৌরবান্বিত? এমনকি, কেন যত্ন সহকারে 'আত্মার সঙ্গে' বলাটা এড়ায়, বরং সর্বত্রই 'আত্মায় গৌরবান্বিত করা' বচনটা আরও সমুচিত বলে পছন্দ করে? আমার দিক দিয়ে আমি এমনটা ঘোষণা করতাম না যে, "মধ্যে" [তথা 'আত্মায়'] শব্দটা কম মর্যাদাপূর্ণ ধারণা বহন করে, কিন্তু এটা বলতাম যে, শব্দটা সঠিক ভাবে বুঝলে তবে মনকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় চালনা করে: এক্ষেত্রে আমরা এটাও লক্ষ করেছি যে, শব্দটা প্রায়ই "সঙ্গে"র বদলে ব্যবহৃত। যেমন, 'আহুতিবলির সঙ্গে' এর বদলে '*আমি আহুতিবলির মধ্যে তোমার গৃহে আসব*' (ক); আরও, '*তিনি রুপো ও সোনাতে তাদের বের করে আনলেন*' (খ), অর্থাৎ 'রুপো ও সোনা-সহ বের করে আনলেন। আরও, 'সেনাবাহিনীর সঙ্গে' এর বদলে, '*তুমি আর বেরিয়ে যাবে না আমাদের সেনাবাহিনীতে*' (গ), এবং এবিষয়ে আরও হাজার হাজার অনুরূপ বচন দ্রষ্টব্য। যাই হোক, আমি এ নবীন প্রজ্ঞা থেকে খুশি মনে শিখতে চাইতাম, তারা শাস্ত্র থেকে আগত ব'লে যে সূত্রটা উপস্থাপন করে, সেই "মধ্যে" সূত্রটা ব্যবহার করে প্রেরিতদূত কেমন গৌরব আরোপ করেছেন। কেননা আমি, 'হে পিতা, পবিত্র আত্মায় তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের দ্বারা তোমার সম্মান ও গৌরব হোক' বচনটা কোথাও পাইনি; এ বচনটা এমন যা এদের কাছে আপাতত, বলতে গেলে, শ্বাসের চেয়েও প্রচলিত হচ্ছে। কেননা এ সূত্রগুলো একক একক ভাবে পাওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু এই অনুক্রমে একসাথে তারা কোন পদে দেখাতে পারবে না। এর ফলে, যা লেখা আছে, তারা যদি সূক্ষ্মভাবে তা মেনে নেয়, তবে দেখিয়ে দিক নিজেদের এ ঘোষণাগুলো তারা কোথা থেকে নেয়। কিন্তু যদি তারা প্রচলিত রীতির সঙ্গে একমত, তাহলে আমাদেরও তেমনটা করতে বাধা না দিক (ঘ)।

৫৯। কেননা আমরা, বিশ্বস্তদের [অর্থাৎ ভক্তদের] ব্যবহারে উভয় সূত্র পাওয়ায় উভয় সূত্র ব্যবহার করে থাকি। একদিকে বিশ্বাস করি, আমরা উভয় সূত্র দ্বারা

সমানভাবেই [পবিত্র] আত্মাকে গৌরব আরোপ করি; অন্যদিকে বিশ্বাস করি, যে সূত্রটা বিষয়ে আলোচনা করছি সেটা দ্বারা আমরা তাদেরই মুখ আরও যথার্থভাবে বন্ধ করছি, কেননা সেই সূত্র এমন অর্থ বহন করে যা শাস্ত্রের অর্থের নিকটতম অর্থ, এবং, দ্বিতীয়ত, যেহেতু সূত্রটা "ও" শব্দের স্থানে ব্যবহৃত, সেজন্য তা প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা তত সহজে আক্রমণ করা যায় না, যদিও সূত্রটা এখনও তাদের দ্বারা বিতর্কের বিষয় হচ্ছে। কেননা 'পল ও সিল্ভানুস ও তিমথি' বলা এবং 'পল তিমথি ও সিল্ভানুসের সঙ্গে' বলা একই। নামগুলোর সংযোজন উভয় সূত্র দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত। তাই, যখন প্রভু বলেন, 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা', তখন যদি আমি, 'পিতা ও পবিত্র আত্মা-সহ পুত্র' বলতাম, তাহলে আমি কি অন্য অর্থবহ কিছু বলতাম? বস্তুতম "ও" সংযোজক শব্দ দ্বারা নামগুলোর সংযোজন সংক্রান্ত সাক্ষ্য বহু। ধন্য পল বলেন, *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ "ও" ঈশ্বরের ভালবাসা "ও" পবিত্র আত্মার সহভাগিতা* (ক); তিনি আরও বলেন, *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দোহাই "ও" আত্মার ভালবাসার দোহাই* (খ)। সুতরাং, আমরা যদি "ও" এর বদলে "সঙ্গে" ব্যবহার করতে ইচ্ছা করতাম, তাহলে কোন্ পার্থক্য এনে দিতাম? আমি কোন পার্থক্য দেখি না, যদি না ব্যাকরণের শীতল নিয়মের খাতিরে কেউ কেউ সেই সংযোজনমূলক সংযোজন পছন্দ না করে যা ঘনিষ্ঠতম সংযোজন সৃষ্টি করে, ও সেই অন্য সূত্র প্রত্যাখ্যান না করে যা সমান কার্যকারিতার অধিকারী নয়। কিন্তু যদি আমাদের এসমস্ত কিছুর বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে হয়, তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দীর্ঘ আলোচনার আমাদের কোন দরকার হত না। তবে, তাদের বিবাদ পদাংশ বিষয়েও নয়, এ কণ্ঠের বা সেই কণ্ঠের স্বর বিষয়েও নয়; না, বিবাদটা এমন বিষয়ে কেন্দ্রীভূত যা অর্থ ও সত্য ক্ষেত্রে বহু পৃথক। এবং এই কারণে, যদিও পদাংশের ব্যবহার কোন কাজের নয়, তবু তারা এগুলো অনুপ্রবেশ করাতে ও মণ্ডলী থেকে সেগুলোতে বর্জন করতে সচেষ্ট। কিন্তু, যদিও একটা শব্দ শোনা মাত্রই তার উপকারিতা সুস্পষ্ট, তবু আমি সেই কারণটাও দেখাব যার খাতিরে আমাদের পিতৃগণ "সঙ্গে" সংযোজক শব্দ-ব্যবহার সুচিন্তিত ভাবে গ্রহণ করলেন। "ও" বা "এবং" পদাংশের সাথে সাবেল্লিউসের শঠতাও প্রত্যাখ্যান করার লক্ষ্যে ছাড়া ও সেটার অনুরূপে হিপোস্তাসিস-ত্রয়ের (গ) ব্যশিষ্ট্য উপস্থাপন করার লক্ষ্যে ছাড়া (যেমন '*আমি এবং পিতা আসব*' (ঘ) ও '*আমি এবং পিতা*

এক’ (৬) ঘোষণা দু’টো প্রতীয়মান), পদাংশটা [তথা “ও” বা “এবং”] পিতা ও পুত্রের অনন্তকালীন সহভাগিতা ও অবিরত সংযোগ বিষয়ে উত্তম রূপে প্রমাণ দেয়। বাস্তবিকই, যিনি বলেছেন, পুত্র পিতার সঙ্গে আছেন, তিনি সেইসঙ্গে হিপোস্তাসিস-দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য ও সেই সহভাগিতার অবিচ্ছেদ্য চিহ্ন দেখিয়েছেন। তেমনটা মানব ব্যাপারেও দেখা যেতে পারে: “ও” বা “এবং” সংযোজন শব্দ মিলিত কর্মক্রিয়ার দিক ব্যক্ত করে, কিন্তু “সঙ্গে” সূত্রটা, কোন এক প্রকারে, একইসঙ্গে সহভাগিতাও দেখায়। যেমন, পল ও তিমথি জলপথে মাকিদনিয়ায় গেলেন; কিন্তু তিখিকস ও অনেসিমকেও কলসীয়দের কাছে পাঠানো হল: এ থেকে আমরা এটা জানি, তাঁরা একই কাজ করলেন। কিন্তু যদি আমরা এমনটা শুনতাম, তাঁরা একসাথে জলপথে যাত্রা করলেন ও একসাথে তাঁদের পাঠানো হলো, তাহলে আমরা এও জানতে পারতাম, তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে তেমনটা করেছিলেন। তাই, অন্য কোন কথা যা করতে পারত না, তেমন সূত্র [তথা “সঙ্গে” সূত্র] সাবেল্লিউসের শঠতা বিলীন করায় তাদেরও আরও বেশি স্পর্শ করে যারা একেবারে বিপরীত ভাবে ঈশ্বরনিন্দা-পাপে পাপ করে। আমি তাদেরই কথা বলছি যারা নানা সময়কাল দ্বারা পিতা থেকে পুত্রকে ও পুত্র থেকে পবিত্র আত্মাকে পৃথক করে।

৬০। “মধ্যে” পদাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য এ: “সঙ্গে” পদাংশটা সহভাগিতায় মিলিত জীবদের পারস্পরিক সংযোগ নির্দেশ করে, যেমন তাদেরই সংযোগ যারা একসাথে জলযাত্রা করে বা একসাথে বসবাস করে, অথবা তাদেরই নির্দেশ করে যারা সবাই মিলে কোন না কোন কর্ম সম্পন্ন করে। কিন্তু “মধ্যে” সূত্রটা সেই স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যক্ত করে যেখানে যারা কর্মরত তারা সবাই রয়েছে। কেননা যদি আমরা এমনটা শুনে থাকি যে, তারা “মধ্যে” জলপথে যাত্রা করছে বা “মধ্যে” বসবাস করছে, তাহলে আমরা সাথে সাথে নৌকা বা ঘরের কথা ভাবি। সাধারণ ব্যবহারে, এটাই হলো নিজেদের মধ্যে সূত্রগুলোর পার্থক্য, এবং পণ্ডিতগণ বিষয়টা আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে পারতেন। কিন্তু সূত্রগুলো সংক্রান্ত সমস্যা ক্ষেত্রে আলোচনা করার সময় আমার নেই। সুতরাং, যেহেতু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, “সঙ্গে” সূত্রটা সংযোগ-ধারণাটা যথার্থভাবে প্রকাশ করে, সেজন্য, তোমাদের ইচ্ছা হলে, তবে তোমাদের জন্য ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণ হোক, ও তোমরা নিজেরাও আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের এ নিষ্ঠুর ও অবিরত যুদ্ধ

চালানো থেকে ক্ষান্ত হও। তথাপি, "সঙ্গে" সূত্রটা এভাবে এবার গৃহীত হলে, যদি কেউ কেউ গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদে নামগুলো সংযুক্ত করতে এবং "ও" সূত্র দিয়ে সেইভাবে গৌরব আরোপ করতে পছন্দ করে যেভাবে আমরা বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে সুসমাচারগুলোতে শিখে থাকি তথা 'পিতা "ও" পুত্র "ও" পবিত্র আত্মা, তাহলে সে নির্দ্বিধায়ই তাই করুক: কেউই আপত্তি করবে না। তোমরা তেমনটা মনে করলে তবে এসমস্ত বিষয়ে, এসো, একমত হই। কিন্তু একথা গ্রহণ করার চেয়ে ওরা বরং থুথুর সঙ্গে জিহ্বাও ফেলে দিত। এটাই আমাদের বিরুদ্ধে অদম্য ও বিরতিহীন যুদ্ধ জাগায়। তারা নাকি বলে, গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ ঈশ্বরের কাছে '"ও" পবিত্র আত্মার কাছে' নয় কিন্তু 'পবিত্র আত্মায়' অর্পণ করতে হয়। তারা আবেগের সঙ্গে এই "পবিত্র আত্মায়" সূত্রকে আঁকড়িয়ে ধরে কেমন যেন সূত্রটা [পবিত্র] আত্মার নিম্ন অবস্থা ব্যক্ত করত। সুতরাং, এবিষয়ে দীর্ঘতর ভাবে আলোচনা করা অনর্থক হবে না। আমরা এতেই স্তম্ভিত হতাম যদি আমাদের বক্তব্য শোনার পর তারা সূত্রটা এমন বিশ্বাসঘাতকের মত অস্বীকার করত যা [পবিত্র] আত্মাকে গৌরব আরোপ করার পক্ষে চলে গিয়ে নিজের আগেকার পক্ষ থেকে পালিয়ে যায়।

২৬শ অধ্যায়। যেই অর্থ হোক না কেন, "মধ্যে" সূত্রটা যেখানে ব্যবহৃত, তা সবসময় পবিত্র আত্মাকে লক্ষ করে।

৬১। বিচার-বিবেচনা করে আমি মনে করি, সহজ ও সংক্ষিপ্ত এই "মধ্যে" সূত্রটা নানাবিধ ও বহুবিধ বিষয় নির্দেশ করতে পারে। তার সমস্ত অর্থে আমরা এটা দেখতে পাই, "মধ্যে" সূত্রটা [পবিত্র] আত্মা সম্পর্কিত ধারণাসমূহের সেবায় রয়েছে। কেননা [তত্ত্ববিদ্যায়] বলা হয় 'রূপ জড়ের "মধ্যে" স্থিত', 'পরাক্রম ধারণকারীর "মধ্যে" স্থিত', 'অভ্যাস অভ্যস্তের "মধ্যে" স্থিত', ইত্যাদি সমরূপ ক্ষেত্রে। এর ফলে, যেহেতু পবিত্র আত্মা যুক্তিসম্পন্ন জীবদের সিদ্ধতর করে তোলেন ও তাদের শ্রেষ্ঠতায় উপনীত করেন, সেজন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাঁকে [গ্রীক যুক্তির পরিভাষা অনুসারে] "রূপ" বলা হয়। কেননা যে কেউ মাংস অনুসারে আর চলে না কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত ও ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত, ঈশ্বরের পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপে নির্মিত [ক], তাকে

আত্মিক বলা হয়। এবং যেমন সুস্থ চোখে দৃষ্টিক্ষমতা পাওয়া যায়, তেমনি পরিশুদ্ধ প্রাণের মধ্যে [পবিত্র] আত্মার কার্যকারী শক্তি বিরাজ করে। এজন্য পল এফেসীয়দের জন্য প্রার্থনা করেন যেন তাদের চোখ প্রজ্ঞার "আত্মায়" আলোকিত হয় [খ]। এবং চারুশিল্প যেমন তারই মধ্যে রয়েছে যে সেই চারুশীল্প আয়ত্ত করেছে, তেমনি [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ তারই মধ্যে সবসময় সহ-বিদ্যমান যে সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করে নিয়েছে যদিও সেই অনুগ্রহ অবিরত কার্যকর হয়ে না থাকে। কেননা যেমন চারুশিল্পও সম্ভাব্য ক্ষমতা অনুসারে শিল্পীর মধ্যে বিদ্যমান, ও তখনই তা বাস্তবে বিদ্যমান যখন শিল্পী সেই ক্ষমতামত কাজ করে, তেমনি [পবিত্র] আত্মা একদিকে তারই মধ্যে সবসময় বিদ্যমান যে তাঁর যোগ্য, ও অন্যদিকে, নবীয় বাণীতে বা আরোগ্যদানে বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডে ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে তিনি কার্যকর হন। দেহে যেমন স্বাস্থ্য বা তাপ বা সাধারণভাবে সেই সমস্ত সহজে অস্থায়ী অবস্থা বিদ্যমান, তেমনি প্রাণে [পবিত্র] আত্মা বিদ্যমান, কিন্তু যারা স্বভাবের অস্থিরতার কারণে গৃহীত অনুগ্রহ সহজে অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে তিনি স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন না: তেমন মানুষ ছিলেন সেই সৌল ও ইস্রায়েল সন্তানদের সেই সত্তরজন প্রবীণ [গ], সেই এল্দাদ ও মেদাদ বাদে—কেননা এটা স্পষ্ট যে, [পবিত্র] আত্মা সকলের মধ্য থেকে কেবল তাঁদেরই উপরে অধিষ্ঠান করেছিলেন—এবং, সাধারণভাবে, যারা জীবন-সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা ক্ষেত্রে তাঁদের মত, তাদেরই উপরে তিনি অধিষ্ঠান করেন। এবং প্রাণের মধ্যে যেমন অন্তস্থলে কল্পিত বা জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত বাণী, তেমনি তখনই পবিত্র আত্মা, যখন তিনি আমাদের মানবাত্মার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, বা যখন আমাদের হৃদয়ে ডেকে ওঠেন 'আব্বা, পিতা', বা যখন আমাদের হয়ে কথা বলেন, যেইভাবে লেখা আছে, '*তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলেন*' [ঘ]। তাছাড়া অনুগ্রহদানগুলো বিতরণ ক্ষেত্রে [পবিত্র] আত্মা অংশগুলোর মধ্যে এককের মধ্যে কল্পিত; কেননা আমরা সবাই একে অন্যের অঙ্গ, কারণ '*আমাদের যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী*' [ঙ]। *সেজন্য 'চোখ হাতকে বলতে পারে না, তোমাকে আমার দরকার নেই; আবার মাথাও পা দু'টোকে বলতে পারে না, তোমাদের আমার দরকার নেই'* [চ]। বরং সমস্ত অঙ্গ [পবিত্র]

আত্মার ঐক্যে খ্রিষ্টের দেহকে পূর্ণ করে তোলে: গৃহীত অনুগ্রহদান অনুসারে সেই অঙ্গগুলো পারস্পরিক ভাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে। কেননা ঈশ্বর দেহে অঙ্গগুলো স্থির করেছেন—এক একটা তাঁর ইচ্ছাক্রমে। তথাপি অঙ্গগুলো একে অন্যের প্রতি একই যত্নশীলতা দেখায় যেহেতু সেগুলো আত্মিক সহভাগিতা অনুযায়ী সহানুভূতির অধিকারী। এজন্য *'একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ গৌরবান্বিত হলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে'* [ছ]। এবং গোটার মধ্যে অংশগুলো ব'লে আমরা এক একজন [পবিত্র] আত্মায় অবস্থান করি: আমরা সকলে একদেহ, যেহেতু এক [পবিত্র] আত্মার উদ্দেশে আমাদের বাপ্তিস্ম হয়েছে।

৬২। এটা বলতে অসাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে সত্য কিছুই নেই যে, [পবিত্র] আত্মা প্রায় পবিত্রীকৃতদের "স্থান" বলেও অভিহিত। এবং এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এধরনের ভাষা [পবিত্র] আত্মাকে নিম্নপদস্থ করে না বরং তাঁকে গৌরবান্বিতই করে। কেননা [ঈশ্বরের] বাণী, স্পষ্টতার খাতিরে, বাস্তব বিষয়ের অর্থবহ নামগুলো প্রায়ই আত্মিক ধারণায় আরোপ করে। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ করেছি, সামসঙ্গীত-রচয়িতা ঈশ্বর সম্পর্কেও বলেন, *হও তুমি আমার জন্য একটি শৈলাশ্রয়ের মত, আমার পরিত্রাণের জন্য একটা দৃঢ় স্থান* [ক]। [পবিত্র] আত্মা সম্পর্কে তিনি বলেন, *দেখ, আমার কাছাকাছি এই এক স্থান আছে; তুমি ওই শৈলের উপরে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াও* [খ]; তবে তিনি "স্থান" বলায় কী লক্ষ করেন? অবশ্যই, "স্থান" বলায় তিনি [পবিত্র] "আত্মায়" সেই দর্শন লক্ষ করেন যে-দর্শনে পৌঁছে মোশি তাঁর কাছে আবির্ভূত ঈশ্বরকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন। এটাই সত্যকার দর্শন-স্থান। শাস্ত্র বলে, *সাবধান, যেকোন স্থান দেখ, সেখানে তোমার আহুতিবলি উৎসর্গ করবে না; কিন্তু যে স্থান প্রভু বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি তা উৎসর্গ করবে* [গ]। তবে সেই আত্মিক আহুতিবলি কী? তা হলো স্তুতিবলি। কোন্ স্থানে তা উৎসর্গ করব? তা পবিত্র আত্মায় উৎসর্গ করব। এশিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছি? সেই স্বয়ং প্রভু থেকে পেয়েছি যিনি বলেন, *সত্যকার উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে* [ঘ]। যাকোব এই স্থান দেখে বলেছিলেন, *প্রভু এই স্থানে আছেন* [ঙ]। এইভাবে [পবিত্র] আত্মা সত্যিই হলেন পবিত্রজনদের "স্থান"। এবং যে পবিত্র, সেও, একই প্রকারে, [পবিত্র] আত্মার পরিচিত "স্থান", কারণ সে

ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাস করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে ও সে তাঁর মন্দির বলেও অভিহিত। কেননা যেমন পল খ্রিষ্টে কথা বলেন, *আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রিষ্টে কথা বলি* (চ), তেমনি খ্রিষ্টও পলের অন্তরে কথা বলেন, যেইভাবে পল নিজে বলেন, *তোমরা একটা প্রমাণ পেতে চাচ্ছ খ্রিষ্টই আমার অন্তরে কথা বলেন* [ইত্যাদি] (ছ) ; আরও, '*সে আত্মায় রহস্যময় কথা বলে*' (জ), এবং, একই প্রকারে, [পবিত্র] আত্মা তার অন্তরে কথা বলেন।

৬৩। তবে এমনটা বলা হয়, [পবিত্র] আত্মা বহু পর্যায়ে ও বহু রূপে সৃষ্টজীবদের "মধ্যে" বিদ্যমান, কিন্তু পিতা ও পুত্র ক্ষেত্রে ভক্তির আরও অনুরূপ বলাটা হচ্ছে, তিনি যে তাদের "মধ্যে" তা নয়, কিন্তু তাদের "সঙ্গেই" আছেন। যারা অনুগ্রহ পাবার যোগ্য ও যাদের মধ্যে তিনি নিজের কর্মগুলো সম্পাদন করেন, তাদের কাছে যে অনুগ্রহ তাঁরই কাছ থেকে আসে যিনি তাদের মধ্যে বসবাস করেন, যথার্থ ভাবে বলা যেতে পারে, যারা তাঁকে গ্রহণ করে সেই অনুগ্রহ তাদের "মধ্যে" রয়েছে। যুগগুলোর পূর্ববর্তী যে অস্তিত্ব ও পুত্র ও পিতার সঙ্গে যে অনন্ত অবস্থান, তা যখন দর্শনের বিষয় হয়, তখন এমন শব্দগুলো মানায় যেগুলো অনন্তকালীন সংযোগ ব্যক্ত করে। কেননা "সঙ্গে হওয়া" সংজ্ঞাটা সেই জীবদের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভাবে ব্যবহৃত যেগুলো একে অন্যের প্রতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে সহ-অস্তিত্বশীল। বাস্তবিকই আমরা বলি, তাপ জ্বলন্ত আগুনের "মধ্যে" রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলতে চাই, তাপ আগুনের সঙ্গে সহ-অস্তিত্বশীল। আমরা বলি, স্বাস্থ্য দেহের "মধ্যে" বা দেহেতে রয়েছে, কিন্তু এটা বলি যে, জীবন প্রাণের সঙ্গে সহ-অস্তিত্বশীল। তাই, যেখানে সহ-প্রকৃতিগত ও অবিচ্ছেদ্য সহভাগিতা যথার্থ ভাবে রয়েছে, সেখানে তা ব্যক্ত করার জন্য যে সূত্র সবচেয়ে কার্যকর, তা হলো "সঙ্গে", কেননা এ সূত্র অবিচ্ছেদ্য সহভাগিতার ধারণা নির্দেশ করে। কিন্তু, যেখানে [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ যাওয়া-আসায় বাধ্য, সেখানে যথার্থ ভাবে ও সত্যকার ভাবে আমরা "মধ্যে" বলি, যদিও, যারা তা গ্রহণ করেছে, [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ, মঙ্গলের দিকে তাদের মনোভাবের স্থিতিশীলতার ফলে, তাদের মধ্যে প্রায়ই বহুদিন ধরে অবস্থান করে। তাই যখন আমরা [পবিত্র] আত্মার স্বীয় যোগ্যতার কথা ভাবি, তখন তাঁকে পিতা "সহ" ও পুত্র "সহ" দর্শন করি, কিন্তু যখন তাঁর অংশগ্রাহীদের মধ্যে সাধিত তাঁর অনুগ্রহ লক্ষ

করি, তখন আমরা বলি, [পবিত্র] আত্মা আমাদের "মধ্যে" আছেন। [পবিত্র] আত্মায় বা [পবিত্র] আত্মার "মধ্যে" আমাদের নিবেদিত গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদও যে তাঁর যোগ্যতা-স্বীকৃতি, তা নয়, কিন্তু আমাদের দুর্বলতাই-স্বীকার। কেননা আমরা এটা দেখাই যে, নিজেদের থেকে গৌরবারোপণ করার সাধ্য আমাদের নেই, কিন্তু আমাদের সাধ্য পবিত্র আত্মায় রয়েছে। যেহেতু আমরা তাঁর মধ্যে দৃঢ়ীকৃত, সেজন্য গৃহীত সমস্ত উপকারের জন্য আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারি; ঈশ্বরের কাছে স্তুতি-অর্ঘ্য অর্পণ করার জন্য আমরা অনিষ্ট থেকে আমাদের বিশুদ্ধতার মাত্রা অনুসারে [পবিত্র] আত্মার কম-বেশি সাহায্য পাই। তাই ভক্তিকে যেভাবে মানায়, আমরা শুধু সেই ভাবে পবিত্র আত্মায় বা পবিত্র আত্মার "মধ্যে" আমাদের ধন্যবাদ নিবেদন করি। 'পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে রয়েছেন, এবং তাঁর থেকে যে অনুগ্রহ আগত তা দ্বারা প্রজ্ঞাবান হয়ে আমি প্রশংসাবাদ উত্তোলন করি' তেমনটা বলায় নিজেদের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া প্রকৃতপক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়। এধরনের ভাষা পলকেই মানায়: '*আমি মনে করি, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পেয়েছি*' (ক); আরও, '*মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর*' (খ)। দানিয়েল সম্পর্কেও বলা হয়, ঈশ্বরের আত্মা তাঁর মধ্যে ছিলেন, ও তেমনটা তাদেরই সম্পর্কে বলা যেতে পারে যারা সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে এনাদের সদৃশ।

৬৪। কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটা অর্থ রয়েছে, এবং এই অর্থ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার নয়: যেমন পুত্রতে পিতাকে দৃষ্ট, তেমনি পুত্র [পবিত্র] আত্মায় দৃষ্ট। [পবিত্র] আত্মার শরণে উপাসনা এমনটা করে যাতে আমাদের মনের কর্মক্রিয়া আলোতে সম্পাদিত হয়, যেইভাবে তুমি সেই সামারীয় নারীর উদ্দেশে উচ্চারিত বাণী থেকে জানতে পার। তিনি নিজের দেশের প্রথা অনুসারে ভুলবশত এমনটা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন যে, উপাসনাটা এক স্থানে সম্পাদন করতে হবে, কিন্তু আমাদের প্রভু তাঁর ভুল ঘুচিয়ে দিলেন; হ্যাঁ, স্পষ্টভাবে নিজেকেই সত্য বলে উপস্থাপন করায় তিনি তাঁকে বরং শিখিয়ে দিলেন যে আত্মা ও সত্যের শরণেই উপাসনা করতে হয় (ক)। যেমন যখন আমরা পুত্রের "মধ্যে" উপাসনার কথা বলি তখন পিতা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই যেন এমন উপাসনার কথা বলি, তেমনি, যখন [পবিত্র] আত্মায় বা [পবিত্র] আত্মার "মধ্যে" উপাসনার কথা

বলি তখন যিনি নিজের মধ্যে প্রভুর ঈশ্বরত্বকে দেখান, তাঁরই “মধ্যে” যেন উপাসনার কথা বলি। তাই উপাসনা ক্ষেত্রেও পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র থেকে অবিচ্ছেদ্য। পবিত্র আত্মার বাইরে থাকলে তুমি কোনও মতে উপাসনা করতে পারতে না; কিন্তু তাঁর মধ্যে থাকলে তুমিও তাঁর কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, যেইভাবে তুমি যা দেখ, তা থেকে আলো পৃথক করতে পার না। কেননা [পবিত্র] আত্মার আলোকীকরণে ছাড়া অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি দেখা সম্ভব নয়। যে প্রতিমূর্তিতে চোখ নিবদ্ধ রাখে, সে সেই প্রতিমূর্তি থেকে আলো পৃথক করতে পারে না: দেখার যে কারণ, তা অবশ্যই দৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে দৃষ্ট হয়। তাই [পবিত্র] আত্মার আলোকীকরণ গুণে আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ঈশ্বরের গৌরবের দীপ্তি দেখতে পাই: ছাপের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁরই কাছে চালিত যিনি সেই ছাপের ও সেটার সমরূপী মুদ্রাঙ্কনের অধিকারী (খ)।

২৭শ অধ্যায়। “সঙ্গে” শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ। মণ্ডলীর অলিখিত ধর্মতত্ত্ব।

৬৫। ওরা বলে, যেহেতু “মধ্যে” সূত্রটা অধিক যথার্থভাবে [পবিত্র] আত্মাকে আরোপণীয়, ও তাঁর বিষয়ে সমস্ত ধারণা ব্যক্ত করার জন্য যথেষ্ট, সেজন্য তোমরা কোন্‌ কারণেই বা এ নতুন সূত্র অনুপ্রবেশ করিয়ে পবিত্র আত্মার “মধ্যে” না বলে [পবিত্র] আত্মার “সঙ্গে” বল এবং এমন শব্দ ব্যবহার কর যেগুলো তত প্রয়োজনীয় নয় এমনকি মণ্ডলীগুলোর ব্যবহারে অন্তর্ভুক্ত নয়? আমরা আগে (ক) বলেছি, “মধ্যে” সূত্রটা পবিত্র আত্মাকে অকারণে আরোপিত নয়, কিন্তু সূত্রটা পিতা ও পুত্রের ক্ষেত্রেও সমানভাবে ব্যবহৃত। এমনকি, আমি মনে করি যথেষ্টই বলেছি যে (খ), সূত্রটা [পবিত্র] আত্মার যোগ্যতা থেকে কিছুই কেড়ে নেয় না, কিন্তু এটাও বলেছি যে, যারা একেবারে দুষ্ট নয়, সূত্রটা তাদের বিচার-বিবেচনাকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উন্নীত করে। তাই, “সঙ্গে” সূত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার মত যা বাকি রয়েছে, তা হলো, সূত্রটা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তার অর্থ কী, ও শাস্ত্রের সঙ্গে তার মিল কেমন।

৬৬। যে সমস্ত ধর্মতত্ত্ব ও ঘোষণা মণ্ডলীতে সংরক্ষিত, সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা লিখিত শিক্ষা থেকে আমাদের কাছে এসেছে, অন্যান্যগুলো আমরা সেই

প্রৈরিতিক পরম্পরাগত শিক্ষা থেকে পেয়েছি যা আমাদের কাছে গুপ্তভাবে সম্প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মভক্তির কাছে দু'টোই একই মূল্যের অধিকারী। এবং যে কেউ মণ্ডলীগত প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার অধিকারী, সেও তা অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা, যদি আমরা অলিখিত সেই প্রথাগুলো বাতিল করতে চেষ্টা করতাম যেগুলো তত গুরুত্ব রাখে না, তাহলে আমাদের অজান্তে সুসমাচারকে ঠিক তার অপরিহার্য অংশে ক্ষতিগ্রস্ত করতাম; আর শুধু তা নয়, আমাদের প্রচারও শূন্য একটা শব্দে সঙ্কুচিত করতাম। যেমন—প্রথম অতিপ্রচলিত প্রথা স্মরণ করতে গেলে—যারা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে প্রত্যাশা রাখে, ক্রুশচিহ্ন দ্বারা তাদের চিহ্নিত করতে কে তা লিখিত আকারে আমাদের শেখাল? কোন্ শাস্ত্র প্রার্থনাকালে পূব দিকে ফিরতে শেখাল? যখন এউখারিস্তিয়ার রুটি ও স্তুতিবাদের পানপাত্র [প্রভুর দেহ ও রক্তকে] দেখায় [ক], সেসময়ে উচ্চারিত এপিক্লেসিসের [অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে মিনতির] কথা যিনি লিখিত আকারে আমাদের কাছে রেখে গেছেন, সেই পবিত্রজন কে? কেননা আমরা প্রেরিতদূতের বা সুসমাচারের কথা নিয়ে তুষ্ট হই না; আমরা সেগুলোর আগে ও পরে আরও এমন কথা যোগ করি যেগুলো রহস্য-ক্রিয়ার জন্য মহৎ অর্থের অধিকারী ও সেগুলো আমরা অলিখিত শিক্ষা থেকে আনি। আমরা বাপ্তিস্মের জল, খ্রিস্মা-তেল ও স্বয়ং বাপ্তিস্ম-প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও আশীর্বাদ করি। কোন্ লেখার অধিকারে আমরা তা করি? আমাদের অধিকার কি সেই নীরব ও রহস্যময় পরম্পরাগত শিক্ষা নয়? বলার আর কি আছে? তেল-পবিত্রীকরণ সম্পর্কে, কোন্ লিখিত কথা তা আমাদের শিখিয়েছে? বাপ্তিস্মের সেই তিনবার ডুবন কোথা থেকে আসে? বাপ্তিস্ম-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রীতি, শয়তানকে ও তার সকল দূতকে প্রত্যাখ্যান: এসমস্ত কোন্ শাস্ত্র থেকে আগত? প্রকাশিত নয় ও গুপ্ত এই যে শিক্ষা আমাদের পিতৃগণ অস্থিরতা ও কৌতূহল মুক্ত নীরবতায় সংরক্ষণ করে এসেছিলেন, এসমস্ত কি তা থেকে আগত নয়? তাঁরা তো ভালই জানতেন যে রহস্যের পবিত্রতা নীরবে সংরক্ষিত। অদীক্ষিতদের পক্ষে যা দর্শন করা মানায় না, সেবিষয়ে লিখিত আকারে শিক্ষা প্রদর্শন করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? যখন সেই মহান মোশি স্থির করলেন, মন্দিরের সকল স্থান সকলের জন্য উন্মুক্ত হবে না, তখন তিনি কি করতে অভিপ্রায় করছিলেন? তিনি অশুদ্ধ সকলকে পবিত্র ঘেরির বাইরে

রাখলেন: সম্পূর্ণ শুচীকৃত যারা তাদের জন্য তিনি প্রথম প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত রাখলেন; ঐশ্বরিক সেবাকর্মের জন্য তিনি কেবল লেবীয়দের যোগ্য বিবেচনা করলেন; যজ্ঞবলি, আহুতিবলি ও উপাসনা-রীতির বাকি সব কিছুর জন্য যাজকদের নিযুক্ত করলেন, এবং তাদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া কেবল একজনকেই পবিত্রধামে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন, এমনকি, সবসময়ের জন্য নয়, বরং তিনি স্থির করলেন বছরে কেবল একদিনের জন্য ও নির্দিষ্ট সময়েই কে ঢুকতে পারবে যাতে সেই ব্যক্তি তেমন অসাধারণ ও অনন্য ঘটনার জন্য বিস্ময়ের সঙ্গে পরমপবিত্রস্থান দর্শন করতে পারে। প্রজ্ঞাবান ছিলেন বলে তিনি ভালই জানতেন, মানুষ যা বিষয়ে অভ্যস্ত হয় ও যা সহজে পেতে পারে, সে তা কেমন সহজে অবজ্ঞা করে, কিন্তু যা কিছু আলাদা রাখা হয় ও যা কিছু বিরল, তা আপনা আপনিই আগ্রহের সঙ্গে অনুসন্ধান জাগায়। একই প্রকারে, মণ্ডলীগুলো সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় যাঁরা শুরু থেকে বিন্যস্ত করেছেন, সেই প্রেরিতদূতগণ ও পিতৃগণ গুপ্ততা ও নীরবতায় রহস্যগুলোর পবিত্র যোগ্যতা সংরক্ষণ করেছেন। কেননা জনতার ও নিম্নস্তরের মানুষের কানে যা পৌঁছয় তা আদৌ আর রহস্য নয়। অলিখিত বিষয়গুলোর পরম্পরার কারণ এটাই যে, কড়া সংরক্ষণের অভাবে পাছে ধর্মতত্ত্বগুলোর বিষয়ে জ্ঞান অভ্যাসে ভিড়ের কাছে অবজ্ঞার বস্তু হয়। ধর্মতত্ত্ব এক জিনিস ও বাণীপ্রচার আলাদা জিনিস। প্রথমটা নীরবে পালিত, কিন্তু দ্বিতীয়টা গোটা জগৎকে লক্ষ করে। শাস্ত্র যে অন্ধকারে নিজেতে ঘিরে রাখে তা এক প্রকার নীরবতা; যারা এগিয়ে আসে, সেই অন্ধকার তাদের পক্ষে ধর্মতত্ত্ব-উপলব্ধি কঠিন করে তোলে। এজন্য আমরা সবাই প্রার্থনাকালে পূব দিকে ফিরে তাকাই; কিন্তু অল্পজনই মাত্র জানে যে, আমরা প্রাচীন মাতৃভূমি সেই পরমদেশ খোঁজ করি যা ঈশ্বর প্রাচ্যদেশে, এদেনে, প্রস্তুত করেছিলেন (খ)। শাব্বাৎ দিনের পরবর্তী প্রথম দিনে (গ) আমরা পায়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করি, কিন্তু আমরা সবাই যে তার কারণ জানি তা নয়। খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়ে ও ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করতে করতে (ঘ) আমরা যে পুনরুত্থানের জন্য উৎসর্গীকৃত দিনে প্রার্থনায় পায়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে মঞ্জুর করা অনুগ্রহ স্মরণ করি তা শুধু নয়, কিন্তু এজন্যও যে, এমনটা মনে হয়, কোন প্রকারে দিনটা ভাবী অনন্ততার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। এজন্য, দিনটা দিনগুলোর আদি হওয়ায় তা মোশি দ্বারা ‘প্রথম’ নয় কিন্তু ‘একমাত্র’ দিন

বলে অভিহিত হল: *‘সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—একমাত্র দিন’* [ঙ], কেমন যেন সেই একই দিনটাই একই চক্র প্রায়ই শুরু করে দিচ্ছিল। এবং সত্যিই এই একমাত্র একই দিনটা হলো অষ্টমও দিন, কারণ নিজেতে সেই প্রকৃত একমাত্র ও সত্যকার অষ্টম দিনকে নির্দেশ করে [চ] যা বিষয়ে সামসঙ্গীত-রচয়িতা সামগুলোর কয়েকটার শিরনামে উল্লেখ ক'রে [ছ] সেই সৃষ্টির পুনর্মিলনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যা এই কালের পরে আসবে, তথা সন্ধ্যাবিহীন ও আগামীবিহীন সেই অনন্ত দিন, সেই অনন্ত যুগ যা কখনও বৃদ্ধ হবে না। সুতরাং প্রয়োজন বোধেই মণ্ডলী আপন ছোটদের, সেই দিনে পায়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা নিবেদন করতে, মানুষ করে তোলে, যাতে করে অনন্ত জীবনের অবিরত স্মরণে আমরা সেই যাত্রার জন্য দরকারী বিষয়-সামগ্রী ব্যবস্থা করতে ভুলে না যাই। প্রতিটি পঞ্চাশত্তমীও সেই পুনরুত্থানের স্মৃতি যা আমরা অনন্ততায় প্রতীক্ষা করি। কেননা সেই একক ও প্রথম দিন সাতগুণ সাত গণনা করলে পবিত্র পঞ্চাশত্তমী কাল পূরণ করে। সেটা প্রথম দিন থেকে শুরু ক'রে সদৃশ পঞ্চাশ দিন-দীর্ঘ কাল ধরে আবর্তন ক'রে সেই একই দিনে শেষ হয়। এইভাবে দিনটা সাদৃশ্যে অনন্ততার অনুকরণ করে, কারণ চক্র-আন্দলনে সেই একই চিহ্নাদি দিয়ে শেষ হয় যে চিহ্নাদি থেকে শুরু হয়েছিল। সেই কালে মণ্ডলী আমাদের পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় অর্পিত প্রার্থনা পছন্দ করতে শেখায়: তেমন সুস্পষ্ট স্মৃতিচারণ গুণে এমনটা হয়, আমরা যেন আমাদের মন বর্তমানকাল থেকে ভাবীকালে স্থানান্তর করি। এবং যতবার আমরা হাঁটুপাত করি ও আবার উঠে দাঁড়াই, ততবার একটা চিহ্নের মধ্য দিয়ে এটা দেখাই যে, আমরা পাপের দরুন মাটিতে পড়ে ছিলাম ও তাঁরই প্রেম দ্বারা স্বর্গে পুনরায় আহূত হয়েছি যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৬৭। মণ্ডলীর অলিখিত রহস্যগুলো ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করলে আমার পুরা এক দিনও যথেষ্ট হত না। বাকি সব কিছু বাদ দিলাম, কিন্তু আমরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় সিশ্বাস-স্বীকারোক্তি কোন্ লিখিত উৎস থেকে পেয়েছি? যদি তা আমাদের গৃহীত বাপ্তিস্ম-পরম্পরা থেকে পেয়ে থাকি, তাহলে, ধর্মভক্তির যুক্তি অনুসারে, যেহেতু আমাদের বিশ্বাসকে আমাদের বাপ্তিস্মের সূত্রের অনুরূপ হতে হয় ও আমরা বাপ্তিস্মের অনুরূপ স্বীকারোক্তি উপস্থাপন করি, সেজন্য, ওরা একই যুক্তি অনুসারে, আমাদের বিশ্বাসের অনুরূপ ভাবে গৌরবারোপণ করতে দিক। কিন্তু, যদি ওরা গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদকে

আমাদের বিশ্বাসের অনুরূপ ভাবে ব্যক্ত করতে অস্বীকার করে এই কারণে যে, তা শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির ও আমরা যা যা উল্লেখ করে এসেছি সেসমস্ত কিছুরও লিখিত প্রমাণ উপস্থাপন করুক। যেহেতু বহু বিষয় রয়েছে যা লিখিত নয় কিন্তু ধর্মভক্তির রহস্য ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য ওরা কি আমাদের এমনটা দেবে না, আমরা পিতৃগণ থেকে আমাদের কাছে আসা সেই একমাত্র শব্দ ব্যবহার করব? কেননা আমরা নিজেরাই তো দেখেছি, সেই একমাত্র শব্দ পথভ্রষ্ট হয়নি এমন মণ্ডলীগুলোতে সরল প্রথা অনুসারে অবস্থান করছে; এবং সেই শব্দ এমন যার অস্তিত্বের পক্ষের যুক্তি কম নয় ও রহস্যের পরাক্রমের পক্ষে কম অবদান রাখে না।

৬৮। সেই সূত্র দু'টোর অর্থ [তথা "মধ্যে" ও "সঙ্গে"] ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সূত্র দু'টো যে কিসেতে মিল রাখে ও কিসেতে পৃথক, তাও ব্যাখ্যা করা হবে; কেননা প্রকৃতপক্ষে সূত্র দু'টো পরস্পর বিরোধী নয় বরং এক একটা সূত্র যা তার স্বকীয়, তা ভক্তিকে এনে দেয়: "মধ্যে" সূত্রটা তা-ই বিশেষভাবে নির্দেশ করে যা আমাদের লক্ষ করে; "সঙ্গে" সূত্রটা ঈশ্বরের সঙ্গে [পবিত্র] আত্মার সহভাগিতা ঘোষণা করে। এজন্য আমরা উভয় সূত্র ব্যবহার করে থাকি: একটার মধ্য দিয়ে [পবিত্র] আত্মার যোগ্যতা চিহ্নিত করি, অপরটার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে বিদ্যমান অনুগ্রহ ঘোষণা করি। এইভাবে আমরা [পবিত্র] আত্মায় বা [পবিত্র] আত্মার "মধ্যে" ও [পবিত্র] আত্মার "সঙ্গে" ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করি; এবং এতে নিজস্ব কিছুই বলি না, কিন্তু, আমরা যা আমাদের নিয়ম স্বরূপ মেনে নিই, প্রভুর সেই শিক্ষার কথা পরস্পরের ঘনিষ্ঠভাবে নিকটবর্তী এমন বিষয়ে স্থানান্তর করি যা রহস্যগুলোতে অপরিহার্য ভাবে মিলিত। বাপ্তিস্মে যা একসাথে উল্লেখ করি, আমরা মনে করি তা বিশ্বাসেও অপরিহার্য ভাবে যুক্ত করতে হয়। তাছাড়া, আমরা বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিকে গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদের উৎস ও মাতা বলে ধারণ করেছি। কিন্তু করার কী আছে? ওরা এখন এসে, আমরা যেভাবে শিখেছি সেইভাবে বাপ্তিস্ম না দিতে, বা আমাদের বাপ্তিস্ম অনুরূপে বিশ্বাস না করতে, বা যা বিশ্বাস করেছি সেই অনুসারে গৌরবারোপণ না করতে আমাদের শিখিয়ে দিক। এমন কেউ এসে আমাদের দেখিয়ে দিক যে এসমস্ত কিছুর মধ্যে প্রয়োজনীয় ও অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা নেই, অথবা দেখিয়ে দিক কেমন করে এসমস্ত কিছুতে নবীনত্ব আনার

ফলে সবকিছুর বিনাশ হয় না। অথচ ওরা আমাদের কানে শুধু এ সুর নিরন্তর বাজাতে থাকে যে, পবিত্র আত্মার "সঙ্গে" গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ প্রমাণিত নয় ও শাস্ত্রে অনুপস্থিত, ইত্যাদি সদৃশ কথা। এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, অর্থের দিক দিয়ে, 'পিতা ও পুত্র "ও" পবিত্র আত্মার গৌরব হোক' বলা ও 'পবিত্র আত্মা সহ পিতা ও পুত্রের গৌরব হোক' বলা একই কথা। প্রভুর খোদ কণ্ঠ থেকে যা আগত, সেই "ও" শব্দটা প্রত্যাখ্যান করা বা বাতিল করা তো সম্ভব নয়; এবং সেটার সমার্থক শব্দ মেনে নেওয়ার জন্য বাধা দেওয়ার মত কিছুই নেই: সেটার তুলনায় শব্দটা যে কেমন পৃথক ও কেমন মিল রাখে, তা আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের বক্তব্যে প্রেরিতদূতও আমাদের নিশ্চিত করেন কেননা তিনিও সূত্র দু'টো সমান ভাবে ব্যবহার করেন, এবং একবার বলেন, *প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে "ও" আমাদের ঈশ্বরের আত্মায়* (ক), এবং আবার বলেন, *তোমরা ও আমার আত্মা আমাদের প্রভু যিশুর পরাক্রমের "সঙ্গে" সমবেত* (খ), এটা ভেবে যে, নামগুলো সংযোগ করার জন্য সংযোজন সূত্রটা বা অব্যয়টা ব্যবহারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

২৮শ অধ্যায়। মানুষ খ্রিস্টের সঙ্গে রাজত্ব করে, শাস্ত্রের এ ঘোষণা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত।

৬৯। এসো, একটু দেখি আমরা আমাদের পিতৃগণের এই ব্যবহারের পক্ষে কিছুটা বলতে পারি কিনা। কেননা, যেহেতু তাঁরাই নিজেদের ধারণা ব্যক্ত করার এই ভঙ্গি শুরু করে দিয়েছেন, সেজন্য আমাদের চেয়ে তাঁরাই তিরস্কারের অধীন। কলসীয়দের কাছে লিখতে গিয়ে পল বলেন, *অপরাধের কারণে ও পরিচ্ছেদনের কারণে মৃত অবস্থায় এই তোমাদের তিনি খ্রিস্টের "সঙ্গে" পুনরুজ্জীবিত করেছেন* (ক)। এমনটা কি হতে পারে যে, ঈশ্বর গোটা জনগণকে ও মণ্ডলীকে খ্রিস্টের সঙ্গে জীবন দান করেন ও পবিত্র আত্মাকে খ্রিস্টের সঙ্গে জীবন দান করেন না? একথা কেবল মনেও কল্পনা করা যখন অভক্তিকর, তখন [পবিত্র] আত্মা স্বরূপে যার অধিকারী তা বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিও যে উপযুক্ত ভাবে ব্যক্ত করবে, তা কি ন্যায়সঙ্গত হত না? আরও, পবিত্রজনেরা যে খ্রিস্টের সঙ্গে রয়েছেন, তেমনটা স্বীকার করা যে অত্যাধিক অনভূতিহীনতা, তা কেমন করে গণ্য করব না

(প্রকৃতপক্ষে দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে পল প্রভুর কাছে বসবাস করেন (খ), ও চলে যাওয়ার পর তখনও খ্রিষ্টের সঙ্গে রয়েছেন (গ)), যখন এরা নিজেদের সাধ্যমতই [পবিত্র] আত্মাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকতে দেয় না, মানুষদের সঙ্গে পবিত্র আত্মা যে অনুপাতে থাকেন সেই অনুপাতেও নয়। তাছাড়া পল সুসমাচার-ব্যবস্থা ক্ষেত্রে নিজেকে ঈশ্বরের সহকর্মী বলে ডাকেন (ঘ); যাঁর দ্বারা সুসমাচার স্বর্গের নিচে থাকা সমস্ত প্রাণীতে ফল আনে, আমরা যদি সেই পবিত্র আত্মাকে সহকর্মী বলে ডাকি, এরা কি আমাদের বিরুদ্ধে অভক্তি দায়ে অভিযোগ তুলবে? আরও, যারা প্রভুতে প্রত্যাশা রেখেছে, তাদের জীবন ন্যায়সঙ্গত ভাবেই 'খ্রিষ্টের "সঙ্গে" ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে; কিন্তু আমাদের জীবন সেই খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন, তখন তারাও *"তাঁর" সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে* (ঙ)। কিন্তু যিনি পাপের বিধান থেকে আমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন (চ), সেই স্বয়ং [পবিত্র] আত্মা কি আদৌ খ্রিষ্টের "সঙ্গে" নেই? তিনি কি তাঁর সঙ্গে গুপ্ত ও আবৃত একটা জীবনেও নেই? তিনি কি সেই গৌরবের বিভায়ও নেই যা আমরা পবিত্রজনদের উপরে আবির্ভূত হবে বলে প্রতীক্ষায় আছি? '*আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী*' (ছ), কিন্তু [পবিত্র] আত্মা কি উত্তরাধিকার-বঞ্চিত ও ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁর খ্রিষ্টের সঙ্গে সহভাগিতা-বিহীন হবেন? আরও, '*স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান*' (জ), কিন্তু আমরা কি প্রভুর কাছ থেকে যা জেনেছি, ঈশ্বরের "সঙ্গে" সহভাগিতার বিষয়ে সেই সাক্ষ্যও [পবিত্র] আত্মাকে দিই না? উন্মাদনার সর্বোচ্চ পর্যায় এটা যে, খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা আমরা এই আশা রাখি যে, যখন তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহকে প্রাণিক থেকে আত্মিক এক দেহে রূপান্তরিত করবেন, তখন আমরা তাঁর "সঙ্গে" পুনরুত্থিত হব ও স্বর্গে তাঁর "সঙ্গে" আসন নেব (ঝ); কিন্তু আমরা কি [পবিত্র] আত্মাকে খ্রিষ্টের "সঙ্গেও" বসতে দেব না, গৌরবও দেব না, ও তাঁর কাছ থেকে যা পেয়ে আছি তাও দেব না? যিনি আমাদের কাছে মিথ্যা না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (ঞ), তাঁর দান অনুসারে আমরা যে সমস্ত দানের বিষয়ে নিজেদের যোগ্য মনে করি, সেই দান পবিত্র আত্মার যোগ্যতার চেয়ে এত উচ্চ যে আমরা তাঁকে তেমন দানগুলোর একটাও দিতে সম্মত নই? প্রভুর "সঙ্গে" সবসময় থাকা তোমার পক্ষে তোমার যোগ্যতার অনুরূপ, ও প্রভুর "সঙ্গে"

চিরকালের মত থাকবার জন্য বায়ুলোকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোকে তোমার কেড়ে নেওয়াটার প্রতীক্ষায় আছ (ট), কিন্তু [পবিত্র] আত্মা যে খ্রিষ্টের "সঙ্গে" আছেন, তুমি কি এখন তা অস্বীকার কর? এবং যে কেউ তাঁকে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে "গণনা" করে ও "সহঅনুক্রমিত" করে, তাকে তুমি অসহ্য ভক্তিহীন বলে নির্বাসিত কর?

৭০। বলার যা বাকি রয়েছে তা বলা আমার লজ্জা লাগে: যেহেতু '*আমরা যদি তাঁর [অর্থাৎ খ্রিষ্টের] দুঃখভোগের অংশীদার হই তবে তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হব*' (ক) সেজন্য তুমি খ্রিষ্টের "সঙ্গে" গৌরবান্বিত হওয়ার প্রতীক্ষায় আছ; কিন্তু পবিত্রতার আত্মাকে তুমি তো খ্রিষ্টের "সঙ্গে" গৌরবান্বিত কর না, কেমন যেন যে সম্মানে তুমি সম্মানিত তিনি সেই সম্মানেরও যোগ্য নন। আরও, তুমি তো খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করবে বলে প্রত্যাশা কর; কিন্তু গৌরবের আত্মাকে দাস ও ভৃত্যের পর্যায়ে নমিত করে তাঁকে অবজ্ঞা কর। এবং গৌরবারোপণে যে এসব কিছু [পবিত্র] আত্মাকে দেয়, তা দেখাবার জন্য আমি এসমস্ত কথা বলছি না, কিন্তু যারা পুত্র ও পিতার সঙ্গে [পবিত্র] আত্মার গৌরবের সহভাগিতাকে অভক্তি বলে এড়িয়ে সেই সমস্ত কিছু তাঁকে দিতে অস্বীকার করে, তাদের অন্যায়-বিশ্বাস দেখাবার জন্যই এসমস্ত কথা বলছি। চোখের জল না ফেলে কেই বা এসমস্ত কিছু হতে দেবে? যে বিশ্বাস-ত্যাগ আমাদের হুমকি দিচ্ছে, বর্তমান অবস্থা যে সেটার পূর্বলক্ষণ (খ), তা কি স্পষ্ট নয়? অবশ্যই স্পষ্ট, এমনকি ব্যাপারটা এত স্পষ্ট যে তা বালকের পক্ষেও বোধগম্য। যা কিছু অনস্বীকার্য তা সন্দেহের বিষয় হচ্ছে। আমরা [পবিত্র] আত্মায় বিশ্বাস করি, এবং ঠিক আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতিতেই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে। আমাদের বাপ্তিস্ম হয়েছে ও এখনও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে। আমরা তো জীবনের প্রণেতা বলে তাঁকে আহ্বান করি, ও দাসত্বের সঙ্গী বলে তাঁকে গণ্য করি। তাঁকে পিতা ও পুত্রের "সঙ্গে" পেয়েছি, ও সৃষ্টির একটা অংশ বলে তাঁকে অসম্মান করি। যারা প্রার্থনায় যে কি যাচনা করা উচিত (গ) তা জানে না, তারা যদিও [পবিত্র] আত্মা ক্ষেত্রে পবিত্র কিছুর মত ব্যক্ত করতে আগ্রহী হয়, তবু মাত্রা বজায় রাখার জন্য নিজেদের কথার স্রোত নিয়ন্ত্রণে রাখে, কেমন যেন যোগ্যতায় তাঁর সমকক্ষ হয়ে গেছে। নিজেদের সেই দুর্বলতায় তারা বিলাপের যোগ্য, কারণ আমরা যে সমস্ত

দানের কার্যকারিতার অভিজ্ঞতা করি, সেবিষয়ে ধন্যবাদ জানানোর মত আমাদের কথা নেই। কেননা [পবিত্র] আত্মা সমস্ত ধারণার অতীত (ঘ), ও যে কথা তাঁর যোগ্যতার হীনতম অংশেরও অনুরূপ নয়, সেই কথাকে অক্ষম বলে সাব্যস্ত করেন, যেইভাবে প্রজ্ঞা পুস্তকে (ঙ) লেখা আছে, *তাঁর বন্দনা কর, কারণ তিনি এর চেয়ে আরও বন্দনীয়। তাঁর বন্দনাগানে তোমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর, ক্লান্ত হয়ে পড়ো না—কারণ তোমাদের একাজ কখনও শেষ হবে না* (চ)। যিনি মিথ্যা বলেন না, তোমরা যারা সেই ঈশ্বরের কাছে শুনেছ যে, পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বর-নিন্দা জনক কথা কখনও ক্ষমা পাবে না, এসমস্ত কথা বলার জন্য সেই তোমাদের অবশ্যই ভয়ঙ্কর কৈফিয়ত দিতে হবে।

২৯শ অধ্যায়। যে পিতৃগণ নিজেদের লেখায় “সঙ্গে” সূত্রটা ব্যবহার করেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য।

৭১। যারা বলে, যে গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ “সঙ্গে” সূত্রটা ব্যবহার করে, তা শাস্ত্রে প্রমাণিত নয়, আমরা তাদের বলি, শাস্ত্রে প্রমাণিত নয় অন্য এমন কিছু যদি গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এটাও গ্রহণ করা না হোক; কিন্তু শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বহু বিষয়ের সঙ্গে যদি অধিকাংশ রহস্যগুলো-উদ্যাপন আমাদের পক্ষে নাগরিকত্বের অধিকার রাখে, তাহলে এটাও মেনে নেওয়া উচিত। আমি মনে করি, অলিখিত পরম্পরাগত শিক্ষাও মেনে নেওয়া প্রৈরিতিক বিচার-মান; কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *আমি এবিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করছি যে, তোমরা সবকিছুতে আমাকে স্মরণ করে থাক, এবং তোমাদের কাছে যে পরম্পরাগত শিক্ষা যেরূপে সম্প্রদান করেছিলাম, সেইরূপেই তা আঁকড়ে ধরে রাখ* (ক); আরও, ‘*সেই পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক, যা আমাদের মুখ বা পত্র থেকে পেয়েছ*’ (খ)। এ পরম্পরাগত শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটা হলো এই গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ যা উত্তরসূরীদের কাছে তাঁদেরই দ্বারা সম্প্রদান করা হলো যাঁরা শুরুতে সেটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন: সেগুলো ব্যবহার কালক্রমে পরিব্যাপ্ত হল, ও দীর্ঘকালীন প্রথার ফলাফলে মণ্ডলীগুলোতে দৃঢ়স্থাপিত হল। কেমন যেন আদালতে লিখিত প্রমাণ না থাকলে আমরা অসংখ্য সাক্ষীর ভিড় হাজির করাতাম, তবে কি তোমাদের কাছ থেকে খালাসের জন্য ভোট পেতাম না? আমি মনে করি, ‘দুই বা

তিনজন সাক্ষীর প্রমাণেই বিচার নিষ্পন্ন হবে’ (গ) ; এবং যদি আমরা তোমাদের স্পষ্টভাবে প্রমাণ করি যে আমাদের পক্ষে [সাক্ষীরূপে] দীর্ঘকাল রয়েছে, তাহলে তোমাদের এটা কি স্বাভাবিক মনে হবে না যে, আমরা এমনটা বলব, এই মামলার জন্য আমরা দায়ী নই? কেননা প্রাচীন ধর্মতত্ত্বসমূহ সম্ভ্রম জাগায় ঠিক সেই ধর্মতত্ত্বসমূহের মত যা পুরাতন প্রাচীনতার জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী। তাই আমি তোমাদের কাছে “সঙ্গে” সূত্রের পক্ষসমর্থকদের তালিকা উপস্থাপন করব, এর ফলে, আমরা যা বিষয়ে নীরব থাকব, তা থেকেও কাল ভাল মত পরিমাপ করা যেতে পারবে। আমরা যে প্রথম হয়ে এ সূত্র প্রবর্তন করেছি তা নয়; এমনকি, তা কেমন করে করতে পারতাম? কেননা যে কাল এই প্রথার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে সেই দীর্ঘতম কালের সামনে, যোবের কথা অনুসারে, আমরা কেবল গতকালেরই মানুষ (ঘ)। নিজের সাক্ষ্য দিতে গেলে আমি নিজেই এই কথা এক প্রকার পিতৃউত্তরাধিকারের মত সংরক্ষণ করি, যেহেতু তা এমন মানুষের (ঙ) কাছ থেকে পেয়েছি যিনি দীর্ঘকাল ধরে ঈশ্বরের সেবায় জীবন কাটিয়েছিলেন, যাঁর হাতে আমার বাপ্তিস্মও হয়েছিল ও মণ্ডলীর সেবায় প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। সেই আমি, প্রাচীন পবিত্র মানুষেরা আজকালে বিতর্কিত এসমস্ত কথা ব্যবহার করেছিলেন কিনা তা খুঁজতে খুঁজতে, তাঁদের মধ্যে এমন অনেককে পেয়েছি যাঁরা প্রাচীনতা ক্ষেত্রেও বিশ্বাসযোগ্য ও জ্ঞানের গভীরতা ক্ষেত্রে আজকালের মানুষদের মত নন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন, গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদের শব্দগুলো যুক্ত করার জন্য, অব্যয় [অর্থাৎ “সঙ্গে” ও “সহ”], অন্য কয়েকজন সংযোজক শব্দ [অর্থাৎ “ও” ও “এবং”] ব্যবহার করেছিলেন; এবং এটা বিচার করেছিলেন যে, ধর্মভক্তির সঠিক ধারণা ক্ষেত্রে উভয় শব্দ-ব্যবহার কোন পার্থক্য আদৌ সৃষ্টি করত না।

৭২। নাম-করা ইরেনেউস, রোমের [বিশপ] ক্লেমেন্ট, রোমের [বিশপ] দিওনিসিউস ও আলেক্সান্দ্রিয়ার [বিশপ] দিওনিসিউস: একথা শোনা অবিশ্বাস্য বটে, কিন্তু এই দিওনিসিউস তাঁর মিতা বিশপের কাছে ‘খণ্ডন ও রক্ষা’ সংক্রান্ত নিজের দ্বিতীয় পত্রে নিজের বক্তব্য এভাবে শেষ করেন (আমি তাঁর কথা অনুবাদ করছি): ‘এনাদের সঙ্গে একমত হয়ে আমরাও, আমাদের পূর্বসূরী প্রবীণগণ থেকে নিয়ম ও আদর্শ গ্রহণ করে তাঁদের সঙ্গে একসুরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, এবং এর ফলে এখন আপনাদের কাছে

প্রেরিত এ পত্র শেষ করি। পবিত্র আত্মা-সহ পিতার কাছে ও আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।' একথাগুলো যে বিকৃত করা হয়েছে তা কেউই বলতে পারবে না; কেননা তিনি যদি আত্মার "মধ্যে" বা "আত্মায়" বলতেন তাহলে জোর দিয়ে এমনটা ঘোষণা করতেন না, তিনি 'নিয়ম ও আদর্শ গ্রহণ' করেছিলেন, যেহেতু এই সূত্র প্রচলিত ব্যবহারেরই সূত্র। কিন্তু অপর সূত্রটার জন্যই পক্ষসমর্থন দরকার ছিল। পত্রের মাঝামাঝি স্থানে তিনি এইভাবে সাবেল্লিউস-পন্থীদের লক্ষ করেন, 'তিনটে হিপোস্তাসিস [ক] আছেন বিধায় যদি ওরা এমনটা বলে সেই হিপোস্তাসিসত্রয় পৃথক, তাহলে ওরা ইচ্ছা করুক বা না করুক, সেই হিপোস্তাসিস সংখ্যায় তিনটেই; নইলে ওরা ত্রিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিক'। আরও, 'এজন্য, ঐক্যের পরে যা আরও বেশি ঐশ্বরিক, তা হলেন ত্রিত্ব'। ক্লেমেণ্টও আরও বেশি প্রাচীন বলার ভঙ্গিতে বলেন, 'জীবিত আছেন ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ও পবিত্র আত্মা'। এবং এখন এসো, শুনি, যিনি প্রেরিতদূতদের আরও নিকট কালে জীবনযাপন করেছিলেন, সেই ইরেনেউস কেমন করে ভ্রান্তমতের বিপক্ষে নিজের লেখা পুস্তকে [পবিত্র] আত্মার কথা উল্লেখ করেন; তিনি বলেন, 'লাগামহীন যারা, যারা যত আবেগে নিজেদের সঁপে দেয় ও ঐশ্বরিক আত্মার প্রতি কোন বাসনা অনুভব করে না, প্রেরিতদূত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তাদের মাংসিক বলেন'। অন্যত্র তিনি বলেন, 'পাছে এমনটা হয়, আমরা ঈশ্বরের আত্মা বিহীন হয়ে স্বর্গরাজ্য হারাই, সেজন্য প্রেরিতদূত চিৎকার করে বলেছেন যে, মাংস স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না'। যে কেউ পালেস্তিনার [খ] [বিপশ] এউসেবিউসকেও তাঁর মহৎ অভিজ্ঞতার জন্য বিশ্বাসযোগ্য মনে করে, তার কাছে আমরা তাঁর 'প্রাচীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে আপত্তি' নামক লেখায় ব্যবহৃত একই কথা দেখাতে পারি। কেননা কথা বলার জন্য নিজেকে উদ্দীপিত করে তিনি এভাবে কথা বলেন, 'আমরা পবিত্র আত্মা-সহ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা নবীদের আলোদানকারী সেই পবিত্র ঈশ্বরকে আহ্বান করি'।

৭৩। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, সেকালের আরও আগে অরিগেনেস সামসঙ্গীত সংক্রান্ত তাঁর অনেক উপদেশে পবিত্র আত্মার "সঙ্গে" গৌরবারোপণ করেন, অথচ [পবিত্র] আত্মা সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা তা তত সঠিক ছিল না; তথাপি প্রচলিত ধারার

জোরে চালিত হয়ে তিনিও [পবিত্র] আত্মা সম্পর্কে ধর্মভক্তির অনুরূপ কথা প্রায়ই ব্যবহার করেছেন। মনে করি, যোহনের সুসমাচারের ব্যাখ্যা-পুস্তগুলোর ষষ্ঠ পুস্তকে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, তাঁকে উপাসনা করা উচিত; তাঁর প্রকৃত কথা এ, 'জলপ্রক্ষালন হলো প্রাণের শুদ্ধীকরণের প্রতীক, যে প্রাণ অনিষ্ট থেকে আগত সমস্ত মলিনতা থেকে ধৌত হয়; তাসত্ত্বেও, উপাসনাযোগ্য ত্রিত্বের ঈশ্বরত্বের কাছে যে নিজেকে নিবেদন করে, তার জন্য সেই জলপ্রক্ষালন মিনতির পরাক্রম দ্বারা অনুগ্রহের দানগুলোর আদি ও উৎস ধারণ করে রাখে'। আরও, রোমীয়দের কাছে পত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'পবিত্র পরাক্রমগুলো একমাত্র জনিতজনকে ও পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বকে ধারণ করতে সক্ষম'। তাই আমি বিশ্বাস করি, পরম্পরাগত শিক্ষার শক্তি প্রায়ই মানুষদের তাদের নিজেদের ধর্মতত্ত্বগুলোকে বিরোধিতা করতে প্রবৃত্ত করেছে। ইতিহাস-লেখক আফ্রিকানুস যুলিউস-ও এপ্রকার গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ সম্পর্কে কিছু জানেন না; তা 'কালের সংক্ষিপ্তসার' এর পঞ্চম পুস্তকে দেখা যায়, যেখানে তিনিও নিজের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেন, 'আমরা যারা সেই শব্দগুলোর সঠিক মাত্রা জানি ও বিশ্বাসের অনুগ্রহ বিষয়ে অজ্ঞ নই, সেই আমরা সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই যিনি তাঁর আপনজন এই আমাদের কাছে বিশ্বের ত্রাণকর্তা ও আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে প্রদান করেছেন: পবিত্র আত্মা "সহ" [বা "সঙ্গে"] তাঁরই গৌরব ও মহিমা যুগে যুগান্তে'। বাকি অন্য সাক্ষ্য বাদ দেওয়া যেতে পারে, অথবা, সেগুলো বিকৃত করা হলে তবে বিকৃতিটা চিহ্নিত করা কঠিন, কারণ পার্থক্য শুধু একটা পদাংশকেই কেন্দ্র করে; কিন্তু যে যে সাক্ষ্য উল্লেখ করেছি, সেগুলো পাঠ্যের বিস্তৃতির জন্য সমস্ত চক্রান্ত এড়ায় ও তাছাড়া এমন সাক্ষ্য বহন করে যা খোদ পাঠ্যেই যাচাই করা যেতে পারে। এবং এই আমি, আমি তো নবীনত্ব-প্রিয় বলে অভিযুক্ত, তাই আমি যা বলতে যাচ্ছি ও হয় তো অন্য পরিস্থিতিতে নগণ্য গুরুত্বের অধিকারী বলে গণ্য হত, তা তার প্রাচীনতা বিষয়ে সাক্ষ্য রূপে আমার পক্ষে দরকারী। আমাদের পিতৃগণের বিবেচনায় সান্ধ্য আলো-দানটা নীরবে গ্রহণ না করা ভাল মনে হল, বরং সেই আলো ফুটলেই ধন্যবাদ জানানো ভাল মনে হল। বাতি প্রজ্বলনের জন্য ধন্যবাদ-ক্রিয়ার সেই বাণীর প্রণেতা যে কে, আমরা তা জানি না; কিন্তু জনগণ সেই প্রাচীন সূত্র উচ্চারণ করে ও যারা বলে 'আমরা পিতা ও পুত্র ও ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার

প্রশংসা করি’ (ক), তারা কেউই কখনও অভক্তি অভিযোগে অভিযুক্ত হয়নি। যে কেউ আথেনোগেনেসের সেই স্তুতিগান জানে যা, তিনি আগুনে নিজের পরিণতির দিকে এগোচ্ছিলেন যেন নিজের সঙ্গীদের কাছে দ্বিতীয় বিদায়-উপদেশ বলে রেখে গেছেন, সে [পবিত্র] আত্মা বিষয়ে সাক্ষ্যমরদের ধারণা যে কী, তা জানে। একথা যথেষ্ট হোক।

৭৪। আমরা মহাপ্রাণ গ্রেগরিকে (ক) ও তাঁর বাণীকে কোথায় স্থান দেব? প্রেরিতদূতদের ও নবীদের মধ্যে স্থান দেব না কেন? তিনি এমন মানুষ যিনি তাঁদের একই আত্মায় বিচরণ করলেন ও সারা জীবন ধরে পবিত্রজনদের পাদচিহ্ন অনুসরণ করলেন, ও যতদিন জীবিত থাকলেন ততদিন ধরে সুসমাচার অনুযায়ী নাগরিকত্বের সঠিক নিয়ম-নীতি সূক্ষ্মরূপে মেনে চললেন। আমরা এটা বলি যে, সত্য বিষয়ে আমরা অন্যায় করতাম যদি ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষদের মধ্যে এই মহৎ প্রাণ পরিগণিত না করতাম যা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে দীপ্তি ছড়ায় এমন মহৎ একটা আলোময় মশালের মত। [পবিত্র] আত্মার সহায়তায় তিনি মন্দাত্মাগুলোর উপরে ভয়ঙ্কর অধিকার রাখলেন, কিন্তু তাছাড়া, জাতিগুলোকে বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে চালিত করার জন্য এমন লাবণ্যের অধিকারী ছিলেন যে, কেবল সতেরোজন খ্রিষ্টিয়ানকে পাওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান দ্বারা তিনি শহরের ও গ্রামাঞ্চলের সমস্ত জনগণকে ঈশ্বরের কাছে চালনা করলেন। তিনি পরাক্রমী খ্রিষ্টের নামে নদনদীর গতিধারার পরিবর্তন ঘটালেন, ও যে হ্রদ লোভী ভাইদের মধ্যে ঝগড়ার কারণ ছিল, তা শুকিয়ে দিলেন। ভাবী ঘটনা সংক্রান্ত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এমন ছিল যা মহান নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে কোন কিছুতেই কম বিস্ময়কর ছিল না। প্রতিটি পরাক্রম-কর্ম ও চিহ্ন ও বিস্ময়কর কাজে [পবিত্র] আত্মা দ্বারা তাঁর মাধ্যমে সাধিত দানগুলোর অতিপ্রাচুর্যের জন্য যিনি মণ্ডলীর শত্রুদেরও দ্বারা ‘দ্বিতীয় মোশি’ বলে অভিহিত হলেন, সেই মানুষের অলৌকিক কাজ বর্ণনা করার জন্য দীর্ঘকাল দরকার হত। তাই অনুগ্রহের উদ্দীপনায় তাঁর সাধিত প্রতিটি কথা ও কর্মে তিনি এমন আলো রূপে দীপ্তিমান হলেন যা স্বর্গীয় পরাক্রমের চিহ্ন স্বরূপ। দেশবাসীদের মধ্যে এখনও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা মহৎ, ও তাঁর সদা নতুন ও স্বচ্ছ স্মৃতি মণ্ডলীগুলোতে দৃঢ়স্থাপিত, এবং সময়ও তা অন্ধকারময় করেনি। তিনি মণ্ডলীর কাছে যা রেখে গেছিলেন, তাছাড়া অন্য কোন ধর্মক্রিয়া, অন্য কোন কথা, রহস্যগুলো-উদ্‌যাপনে অন্য কোন পরিবর্তন যোগ করা

হয়নি। এজন্যই আমরা যা কিছু করে থাকি তার মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে যা অপূর্ণাঙ্গ বোধ হয়, যেহেতু সেগুলো প্রাচীনতম এক পর্যায়ে থেমে গেছিল। কেননা মণ্ডলীতে যাঁরা তাঁর উত্তরসূরী হলেন, তাঁরা তাঁর পরে যা কিছু উদ্ভাবন করা হয়েছে সেই সবকিছুর কোন কিছুই গ্রহণ না করা ভাল মনে করলেন। এবং গ্রেগরির প্রতিষ্ঠিত একটা গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদের পাঠ্য যা তাঁর পরম্পরাগত শিক্ষা হিসাবে মণ্ডলীতে সংরক্ষিত, সেটাই আজকালে বিতর্কিত বিষয়। এবং যে কেউ একটু চলাচল করতে পারে, এবিষয়ে নিশ্চয়তা অর্জন করার জন্য তার পক্ষে বেশি কষ্ট করা লাগবে না। এই বিশ্বাস যে আমাদের ফির্মিলিয়ানুসেরও বিশ্বাস ছিল, এবিষয়ে তাঁর রেখে যাওয়া উপদেশগুলোই [(খ)] সাক্ষ্য দেয়। এবং সেই মেলেতিউসও [(গ)] যে সম্পূর্ণ রূপে একই অভিমত সমর্থন করতেন, একথা তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই বলেন। কিন্তু আমরা কেন অতীতকালের কথা বলছি? আজও প্রাচ্যদেশে ভক্তপ্রাণ মানুষদের চিনে নেওয়ার একমাত্র যে উপায় রয়েছে, সেটা কি এই শব্দ [তথা গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদে ব্যবহৃত সূত্র] নয় যা তাঁদের একপ্রকার চিহ্ন রূপে পৃথক করে? মেসোপতামিয়ার একজন মানুষ যিনি নিজের ভাষায় দক্ষ ও যথার্থ ধারণার অধিকারী, তাঁর কাছ থেকে আমি একথা শুনতে পেয়েছি যে, তাঁর দেশের ভাষায় ইচ্ছা করলেও তাঁরা অন্য রকম ভাবে সেই শব্দ ব্যক্ত করতে পারবেন না, কিন্তু তাঁদের পক্ষে “ও” বা “এবং” সূত্রটার মাধ্যমেই গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ ব্যক্ত করা প্রয়োজন, বা এমন শব্দ দ্বারা যা তাঁদের দেশের ভাষায় সেটার অনুরূপ। সেই অনুসারে কাপ্পাদোকিয়ার মানুষ আমরাও আমাদের দেশীয় ভাষা ব্যবহার করি, কেননা [পবিত্র] আত্মা ভাষা-বিভক্তির সময়েই [(ঘ)] এই সূত্রের উপকারিতা পূর্বদর্শন করেছিলেন। এবং সবগুলো হোক বা সবগুলোর একটু কম হোক পশ্চিমা দেশগুলো ইল্লিরিকম থেকে আমাদের দেশের সীমা পর্যন্ত কি এই সূত্র উচ্চারণ করে না?

৭৫। আমি যখন এই সূত্রের প্রবর্তক ও সমর্থনকারী হিসাবে কতগুলো দেশ ও শহর, এমন প্রথা যা সমস্ত মানব স্মৃতির চেয়ে প্রাচীন যে প্রথা, ও এমন মানুষকেও উল্লেখ করি যাঁরা ছিলেন মণ্ডলীর স্তম্ভ ও [পবিত্র] আত্মা সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান ও শক্তিতে উৎকৃষ্ট, তখন আমি কেমন করে নবীনত্ব-প্রিয় ও নতুন সূত্রের প্রবর্তক হতে পারি? এসমস্ত কিছুর জন্যই আমাদের বিরুদ্ধে এ শত্রুদল জেগে উঠেছে। প্রতিটি শহর ও গ্রাম,

এমনকি অধিক দূরবর্তী অঞ্চলও এমন মানুষে পরিপূর্ণ যারা আমাদের নিন্দা করে। যে শান্তির অন্বেষণ করে, তার মনের জন্য এসবকিছু দুঃখজনক ও ব্যথাদায়ী। কিন্তু, বিশ্বাসের খাতিরে সহ্য করা কষ্টে যেহেতু সহিষ্ণুতার পুরস্কার মহৎ [ক], সেজন্য এসব কিছু ছাড়া খড়্গও জ্বলে উঠুক; কুঠার শাণিত হোক; বাবিলনের সেই আগুনের চেয়ে তীব্রতর আগুন জ্বলুক [খ]; ও আমাদের বিরুদ্ধে যত নির্যাতন-যন্ত্র সচল করা হোক: যারা [পবিত্র] আত্মার নিন্দা করে তাদের বিরুদ্ধে প্রভু যে হুমকি নিক্ষেপ করেছেন, সেই হুমকি ভয় না পাওয়ার চেয়ে বেশি ভয় করার মত আমার পক্ষে অন্য কিছুই নেই। আমি যা বলে এসেছি, তা প্রজ্ঞাবানদের জন্য যথেষ্ট প্রতিরক্ষা স্বরূপ, কেননা এমন সূত্র গ্রহণ করে নিই যা পবিত্রজনদের কাছে প্রিয় ও সুপরিচিত ও মজবুত প্রথা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত; কেননা যে সময় থেকে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছে আজ পর্যন্ত এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই সূত্র মণ্ডলীগুলোতে নাগরিকত্বের অধিকারী, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা যে, সূত্রটা ভক্তি ও পবিত্রতায় পূর্ণ অর্থ বহন করে। প্রধান আদালতের জন্য আমরা কেমন আত্মপক্ষ সমর্থন প্রস্তুত করেছি? সবকিছুর আগে এটা যে, [পবিত্র] আত্মাকে গৌরবান্বিত করার জন্য সেই সম্মানই আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে যা প্রভু, বাপ্তিস্মে তাঁকে নিজের সঙ্গে ও পিতার সঙ্গে সংযুক্ত করায় তাঁকে দান করেন; দ্বিতীয়টা এটা যে, তেমন দীক্ষার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর-জ্ঞানে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে; এবং পরে, সবকিছুর উপরে, প্রভুর সেই হুমকির ভয় যা অযোগ্য ও নগণ্য সমস্ত ধারণার চিন্তা দূর করে দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বীরা কী বলবে? তারা নিজেদের ঈশ্বর-নিন্দার জন্য কেমন সমর্থন পাবে? তারা তো প্রভুর দেওয়া সম্মান মেনে নেয়নি, তাঁর হুমকি ভয় পায়নি। নিজেদের দণ্ড ভোগ করা বা এখনও নিজেদের অভিমত পরিবর্তন করা তাদের উপর নির্ভর করে। আমার দিক দিয়ে, আমি বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করি, দয়াবান ঈশ্বর এমনটা মঞ্জুর করুন যেন তাঁর শান্তি সবার অন্তরে রাজত্ব করে, যাতে করে যারা আমাদের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠে ও তীব্রতার সঙ্গে দলবদ্ধ হয়, তারা যেন কোমলতা ও ভালবাসার [পবিত্র] আত্মায় নিমজ্জিত হয়। এবং যদি এমনটা হয়, তারা একেবারে রূঢ় ও অদম্য হয়ে গেছে, তাহলে তিনি আমাদের এমনটা মঞ্জুর করুন যেন তাদের কাছ থেকে যা আসবে তা যেন সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করতে পারি। যাই হোক, যারা নিজেদের মধ্যে

মৃত্যুদণ্ড বহন করে, তাদের পক্ষে বিশ্বাসের খাতিরে কষ্টভোগ করা ব্যথাজনক নয়, কিন্তু সেই বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম না করাই অসহ্য; ক্রীড়াঙ্গনে লড়াই করে যারা, লড়াইতে আঘাতগ্রস্ত হওয়া তাদের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার নয়, ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশাধিকার না পাওয়াই গুরুতর। কিন্তু এমনটা হতে পারে, এই কাল ছিল '*নীরব থাকার কাল*' [গ], যেইভাবে প্রজ্ঞাবান শলোমন বলেন। কেননা, যখন এত তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা জগৎকে দখল করেছে, তখন, বাস্তব ক্ষেত্রে, আকাশে-বাতাসে চিৎকার করায় কী লাভ? তাদেরই মন সেই ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা বিভ্রান্ত, যারা এমন বাণী পেয়েছে যা মিথ্যা যুক্তির ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ, সেইভাবে যেভাবে চোখ ধুলায় আক্রান্ত ও কান ভয়াবহ ও অদ্ভুত শব্দে স্তব্ধ: সবই কাঁপছে, সবই বিনাশের সম্মুখীন।

৩০শ অধ্যায়। **মণ্ডলীগুলোর বর্তমান অবস্থা-পরিস্থিতি।**

৭৬। সুতরাং, বর্তমান অবস্থা-পরিস্থিতি কিসের সঙ্গে তুলনা করব? তা সমুদ্র-যুদ্ধে অভিজ্ঞ এমন যুদ্ধপ্রিয় যোদ্ধাদের দ্বারা শুরু করা নৌ-সংগ্রামের মত যাদের মন প্রাচীনকালীন বিবাদের কারণে একে অন্যদের বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত। সুতরাং তুমি এ দৃশ্য কল্পনা কর: দুই দিক থেকে নৌবহর ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ চালায়; পরে, অপূরণীয় রোষের বিস্ফোরণের মধ্যে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই। ইচ্ছা করলে এটাও কল্পনা কর যে, তীব্র ঝড়ের কারণে নৌবহর ছত্রভঙ্গ হয়; মেঘলোক থেকে হঠাৎ করে নেমে আসা ঘন অন্ধকার গোটা দৃশ্যতা এমন ভাবে অন্ধকারময় করে যার ফলে মিত্র ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য আর চেনা যায় না যেহেতু কোলাহলের কারণে পতাকাগুলো আর চেনা যায় না। চিত্রটা আরও জীবন্ত করার জন্য এটাও বলব যে, উচ্ছ্বসিত সমুদ্র গভীর থেকে ঊর্ধ্বের দিকে ছটফট করে; মেঘমালা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, ও ঢেউজনিত তরঙ্গ উত্তাল ও ভয়ঙ্কর; তাছাড়া চারদিক থেকে বাতাস একস্থানের উপরেই মাত্র কেন্দ্র করে বয়; ঠিক তখনই নৌবহর দু'টো একে অন্যের সংঘর্ষে আসে। যারা সংগ্রাম করছে তারা কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে একই সংগ্রাম চলতে চলতে অপর পক্ষে পার হয়; অন্য কেউ এমন প্রয়োজনে দাঁড়ায় যখন সেই জাহাজও তাড়ানো দরকার যেগুলো বাতাস নিজের গায়ে ঠেলা দেয় ও সেইসঙ্গে আক্রমণকারীদেরও প্রতিরোধ করা দরকার;

তাই কর্তৃপক্ষের জেদ ও মাতব্বরি করার এক একজনের বাসনা জনিত বিপ্লবের ফলে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়। তাছাড়া, তুমি সমুদ্রের উপর ঘূর্ণিঝড় জনিত অনির্দিষ্ট ও এলোমেলো গর্জনধ্বনি, নৌকাগুলোর মড়্মড়্ শব্দ, উত্তাল তরঙ্গ ও সেই যোদ্ধাদের চিৎকার কল্পনা কর যারা যা ঘটছে সেটার কারণে হইচই করে, কারণ সেনাপতির ও কর্ণধারেরও গলা আর শোনা যায় না, কিন্তু ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা ও এলোমেলোতা রাজত্ব করে ও জীবন বাঁচাবার নিরাশায় অমঙ্গলের আতিশয্য ভুল করার সব ধরনের প্রবণতা উত্তেজিত করে। তাছাড়া তুমি প্রতিকারের অতীত একটা প্লেগ রোগও যোগ কর, অর্থাৎ গৌরব লাভের এমন উন্মাদনা যার ফলে নৌকাগুলোর ডুবাডুবির মধ্যেও নাবীকেরা প্রথম স্থানের জন্য প্রতিযোগিতা করে থাকে।

৭৭। এখন তুমি, সেই দৃশ্য থেকে, এসবকিছুর নমুনা যা, সেই অমঙ্গলে পার হও। অনেক দিন থেকে এমনটা কি মনে হচ্ছিল না যে, ঈশ্বরের মণ্ডলীর বিপক্ষে যা রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই আরিউস-ধর্মবিচ্ছেদ একাই তার বিরুদ্ধে শত্রুভাব ধারণ করেছিল? তারপর, দীর্ঘ ও দুঃখজনক বিবাদের পরে যখন তারা আমাদের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত লড়াই শুরু করে দিল, তখন বহু স্থানে ও বহু ভাবে এমন যুদ্ধ বেধে গেল যার ফলে চলতি শত্রুভাব ও ব্যক্তিগত সন্দেহ সকলের মধ্যে মিমাংসার অতীত হিংসা জাগাল। মণ্ডলীগুলোর বর্তমান অস্থিরতা কি সমুদ্রের ঝড়ের চেয়ে হিংস্র নয়? তার কারণেই তো আমাদের পিতৃগণের বসানো সমস্ত সীমানা-চিহ্ন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে (ক); ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ভিত ও সমস্ত প্রতিরক্ষা ধ্বংস করা হয়েছে। যা কিছু মজবুত ভিত্তির উপরে দাঁড়াচ্ছিল, এখন তা সবই কম্পান্বিত ও উল্টোপাল্টো, এবং আমরা একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একে অন্যকে প্রতিরোধ করি। এবং শত্রু তোমাকে আঘাত না করে থাকলে তবে তোমার সহকারীই তোমাকে আহত করে। এবং তুমি তো আহত হয়ে পড়, তোমার সঙ্গী তোমার উপর দিয়ে পার হয়। এতেই মাত্র আমরা একে অন্যের সঙ্গে একত্রিত, তথা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে আমাদের একই ঘৃণা। পরে, শত্রু চলে গেলেই আমরা শত্রুর মতই একে অন্যের দিকে তাকাই। তেমন অবস্থা-পরিস্থিতিতে কে গণনা করতে পারে কতগুলো নৌকাডুবি হয়েছে? নানা নৌকাডুবির মধ্যে কয়েকটা হয়েছে শত্রুদের আক্রমণের ফলে, আরও কতগুলো নৌকাডুবি মিত্রদের গুপ্ত বিশ্বাসঘাতকতার

ফলে, আরও কতগুলো সেনাপতিদের অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে; এইভাবে, ভ্রান্তমতপন্থীদের ডুবে যাওয়া ফন্দি-ফিকিরের সংঘর্ষে এসে পুরা কতগুলো মণ্ডলীর বিনাশ হয়েছে; পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগের শত্রুদের মধ্য থেকে অন্য কয়েকজন হাল ছেড়ে বিশ্বাসে তাদের নৌকাডুবি হয়েছে। তাছাড়া, এই জগতের অধিপতিদের অনুপ্রবিষ্ট অস্থিরতা কি যেকোন ঝড় ও ঝড়ঝঞ্ঝার চেয়েও জাতিগুলোকে উল্টোপাল্টো করে না? অন্ধকারময়, বিষণ্ন ও আশাহীন রাত্রি মণ্ডলীগুলোর উপরে বিস্তার লাভ করছে, কারণ জাতিগুলোর প্রাণ আলোকিত করার জন্য ঈশ্বর জগতের যে আলোগুলো বসিয়েছিলেন সেই আলোগুলো নির্বাসিত হয়েছে। প্রভাবশালীদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আতিশয্য তাদের সমস্ত চেতনা কেড়ে নেয় অথচ ইতিমধ্যে বিশ্বময় ধ্বংসের ভয় অবশ্যম্ভাবী। পুরা একটা জাতির বিশ্বময় যুদ্ধের চেয়ে ব্যক্তিগত শত্রুভাব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যাদের জন্য সম্মানের ভালবাসার অবিলম্বিত ফল বিলম্বিত মজুরির চেয়ে শ্রেয়, তাদের জন্য নিজেদের বিরোধীদের জয় করার গৌরব সাধারণের সুবিধার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সবাই একইভাবে ও প্রত্যেকে নিজের সাধ্যমত একে অন্যের উপরে নিজ নিজ নরঘাতী হাত তোলে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যারা একে অন্যের উপর রুখে দাঁড়ায় তাদের রূঢ় চিৎকার, অবিরত কোলাহলের এলোমেলো শব্দ ও অনির্দিষ্ট ধ্বনি ইতিমধ্যে নিকট থেকে গোটা মণ্ডলী পূর্ণ করেছে ও তেমনটার ফলে ভক্তির ধর্মতত্ত্বকে বাঁকা পথে সরিয়ে দিয়েছে। কেননা কেউ কেউ ইহুদীধর্মের প্রবাহ দ্বারা তিন 'প্রসোপোন' [πρόσωπον - ব্যক্তিকে] একীভূত(খ) করতে আকর্ষিত, অন্য কেউ গ্রীক দর্শনের প্রবাহ দ্বারা [ঐশ্বরিক] স্বরূপদের পরস্পর বিরোধী করতে আকৃষ্ট; ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত শাস্ত্রও মধ্যস্থতা করার মত সুযোগ পায় না, প্রৈরিতিক পরম্পরাগত সমস্ত শিক্ষাও তাদের যত বিবাদে সালিস করতে পারে না। এখন বন্ধুত্বের একমাত্র লক্ষ্য হলো নিজের ইচ্ছামত কথা বলা; ও শত্রুতার যথেষ্ট কারণ হলো অভিমতে একমত না হওয়া। বিপ্লবের একতার পক্ষে, একই ভুলে সহভাগিতা যত দুরভিসন্ধির চেয়ে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য। যেকোন একজনই, এমনকি, সহস্র কালিমায় কলুষিত যার প্রাণ, সেও এখন ঐশতত্ত্ববিদ। এর ফলে, নবীনত্ব-প্রিয়দের জন্য পক্ষপাতীদের প্রাচুর্য অপরিমেয়। তাই স্বনির্বাচিত ষড়যন্ত্রকারীরা পবিত্র আত্মার সঙ্কল্প উপেক্ষা করে মণ্ডলীগুলোর সভাপতিত্ব নিজেদের

মধ্যে ভাগ ভাগ করে নেয়; এবং যেহেতু সুসমাচার-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিশৃঙ্খলা দ্বারা একেবারে এলোমেলো হয়ে গেছে, সেজন্য বিশপ-আসনের লক্ষ্যে সংঘর্ষণ বর্ণনার অতীত: বিশপ-পদের লোভে যারা নিজেদের দেখাতে চায় তারা এক একজন সভাপতিত্বে নিজের নাম গৃহীত করার জন্য অন্যায়-বল প্রয়োগ করে। তেমন প্রভাব-পিপাসা থেকে নির্গত ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য জাতিগুলোর মধ্যে স্থান নিয়েছে, যার ফলে নেতাদের আহ্বান অকেজো ও অর্থশূন্য হয়ে থাকে যেহেতু অজ্ঞতাসূচিত ঔদ্ধত্যের কারণে এক একজন মনে করে, কারও প্রতি বাধ্যতা দেখানোর চেয়ে সে কারও কাছে আজ্ঞা দিতেই বাধ্য।

৭৮। এসমস্ত কারণেন জন্য আমি ভাবছিলাম, কথা বলার চেয়ে নীরব থাকা ভাল, যেহেতু একটা মানব কণ্ঠ শোনা তত শব্দের মধ্যে সম্ভব নয়। কেননা '*প্রজ্ঞাবানদের কথা শান্তশিষ্টতায় শোনা হয়*' (ক) উপদেশকের এ বাণী যদি সত্য হয়, তবে এতে নিশ্চিত হতে হবে যে, বর্তমান অবস্থা-পরিস্থিতির জন্য এ বিষয়ে আলোচনা করা অধিক উপযোগী। নবীর এ বাণীও আমাকে স্পর্শ করে, '*সেসময়ে সুবিবেচক মানুষ নীরব থাকবে, কেননা এ অমঙ্গলের সময়*' (খ); হ্যাঁ, এ এমন সময় যখন কেউ কেউ তোমাকে হোঁচট খাওয়ায়, অন্য কেউ পড়ে থাকা মানুষকে অপমান করে, আবার অন্য কেউ তালি দেয়, এবং এমন কেউ নেই যে সমবেদনশীল হয়ে পতিতজনের প্রতি হাত বাড়ায়। অথচ প্রাচীন বিধান মতে, শত্রুর ভারবাহী পশুকে বোঝার ভারে পড়া অবস্থায় দে'খে যে সোজা এগিয়ে চলত (গ) সে দণ্ডিত হত। কিন্তু আজকালে সেরকম আর নয়। কেন? কারণ ভালবাসা সব দিক দিয়ে শীতল হয়েছে; ভ্রাতৃ মিল বিলীন হয়েছে এমনকি মিল-সঙ্গতি নামটাও অজ্ঞাত; ভালবাসাপূর্ণ উপদেশ বিলীন হয়েছে; খ্রিষ্টীয় মনোভাব বলতে আর কিছু নেই, দয়া জনিত অশ্রুজলও আর নেই। দুর্বলকে বিশ্বাসে সুস্থির করবে এমন কেউ নেই, কিন্তু একই গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা এতই জ্বলে উঠেছে যে, নিজেদের সৎকর্মের বিষয়ে যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে প্রতিবেশীর দুর্বিপাকের বিষয়েই বেশি আনন্দ হয়। যেমন মহামারীর সময়ে অন্যান্যদের মত তারাও অসুস্থ হয় যারা সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়েছে কারণ তারা সংক্রামিত লোকদের সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি এখন, যা আমাদের মনকে দখল করেছে সেই বিরোধিতা-অনিষ্টের প্রতি

আগ্রহের বশীভূত হয়ে আমরা সবাই একে অন্যের সদৃশ হয়েছি। এজন্যই ভ্রান্ত ঘটনার নির্দয় ও কড়া বিচারকেরা বিচারাসন নেয়, ন্যায্য ঘটনার অন্যায়কারী ও জঘন্য নীরিক্ষকেরা আসন নেয়। এবং এমনটা মনে হয়, অমঙ্গল আমাদের মধ্যে এমনভাবে স্থান নিয়েছে যে, বোধশূন্য জন্তুদের চেয়েও বোধশূন্য হয়েছি, কেননা পশুরা একই জাতের হলে নিজেদের মধ্যে সংসর্গ করে, কিন্তু আমরা প্রতিবেশীদের প্রতিই বেশি যুদ্ধ করি।

৭৯। এসমস্ত কারণের জন্য নীরব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু ভালবাসা বিপরীত দিকে টানল, সেই যে ভালবাসা স্বার্থপর নয় (ক), কিন্তু অবস্থা-পরিস্থিতির যেকোন কাঠিণ্যের উপর জয়ী হতে চায়। এবিষয়ে, বাবিলনে সেই বালকেরাও (খ) আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন ধর্মভক্তির পক্ষে দাঁড়াবার মত কেউ থাকে না, তখন কর্তব্য কর্ম আমাদের একাই পূরণ করতে হয়: তাঁরা আগুনের শিখার মধ্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন, সত্যের বিদ্রূপকারীর দলের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তাঁরা বরং এতে তুষ্ট ছিলেন যে, তিনজন হওয়ায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্তব্য পূরণ করতে সক্ষম ছিলেন। এজন্য শত্রুদের মেঘ আমাদের আতঙ্কিত করে না, এমনকি [পবিত্র] আত্মার সহায়তায় ভরসা রেখেছি ও সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে সত্য ঘোষণা করেছি। যখন আমাদের তত প্রতাপশালী মিত্র ও রাক্ষাকর্তা আছেন, তখন সেই আমরা যদি পিতৃগণের পরম্পরাগত শিক্ষা থেকে আগত ও এ বর্তমানকাল পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্মৃতিতে সংরক্ষিত সেই বাণীর সেবাকর্মী হতে ভীত হতাম, তাহলে [পবিত্র] আত্মার নিন্দুকেরা যে এত সহজে ধর্মভক্তির অনুরূপ ধারণার বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখায়, এটাই কি সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হত না? আর শুধু তা নয়; যা আমাদের উৎসাহ পুনর্জাগরিত করেছে, সেটা হলো তোমার অকপট ভালবাসার আগ্রহ ও তোমার সেই গম্ভীর ও শান্তশিষ্ট স্বভাব যা আমাদের এতে নিশ্চিত করছিল যে, আমরা যা বলতে যাচ্ছিলাম তা বহুজনের কাছে প্রচারিত হবে না; তা যে গোপনে রাখা দরকার এজন্য নয়, কিন্তু একারণে যে, মণিমুক্তা শূকরের সামনে ফেলাতে নেই (গ)। এসমস্ত বিষয়ে এটা যথেষ্ট হোক। আমি যা বলে এসেছি, তা যদি তোমার পক্ষে যথেষ্ট, তাহলে এসো, এই আলোচনা এখানে শেষ করে দিই; আলোচনাটা তোমার অপূর্ণাঙ্গ মনে হলে, তবে এমন কোন বাধা নেই যাতে তুমি

সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে যাও ও বিবাদমুখী নয় এমন প্রশ্ন উপস্থাপন করে তোমার জ্ঞান ধনবান কর। প্রভু এমনটা মঞ্জুর করবেন যেন, যা এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, তা, হয় আমাদের মধ্য দিয়ে, না হয় অন্যান্যদের মধ্য দিয়ে পূরণ করা হয়, সেই জ্ঞান অনুসারে যা [পবিত্র] আত্মা তাদেরই কাছে প্রদান করেন যারা সেটার যোগ্য। [আমেন]।

---

১ (ক) যেমন উপরে, ভূমিকায়, বলা হয়েছে, সেই অনুসারে, 'থেওলোগিয়া' শব্দের সাধারণ অর্থ হলো 'ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব' (২ ও ১২ অধ্যায় দ্রঃ); কিন্তু এখানে, এবং ৪৫ ও ৪৭ অধ্যায়ে, অর্থ হলো 'ঐশত্রিত্ব-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব'। ৪র্থ শতাব্দীর গ্রীক পিতৃগণের ভাষায় 'থেওলোগিয়া' শব্দটা সবসময় 'ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব' অর্থ বহন করে। তাই সাধু বাসিল এ পুস্তকের শুরু থেকেই নিজের অনুসন্ধানের সঠিক প্রেক্ষাপট (তথা ধর্মতত্ত্ব) নির্ধারণ করেন।

(খ) লুক ১১:১০।

২ (ক) প্রবচন ১৭:২৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(খ) ইশা ৩:৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(গ) 'থেওলোগিয়া': এখানে শব্দটার অর্থ হলো, 'ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব'।

(ঘ) সাধু বাসিল বিশেষভাবে সেই পদাংশেরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন যা ত্রিত্বের গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদে ব্যবহৃত, ও সেকালে বিবাদ ও বিচ্ছেদের কারণ হয়েছিল, তথা, 'দ্বারা', 'মধ্যে, 'সঙ্গে' ইত্যাদি পদাংশ।

(ঙ) 'শিক্ষার্থীদের পক্ষে': মণ্ডলীর ভাষায় তারাই শিক্ষার্থী বলে অভিহিত ছিল যারা বাপ্তিস্ম উপলক্ষে ধর্মশিক্ষা নিত; কিন্তু এখানে সাধু বাসিল সম্ভবত সেই সকলকেও লক্ষ করেন যাদের পক্ষে বিশ্বাস বিষয়ে গভীরতর জ্ঞান লাভ করা দরকার।

(চ) 'থেওলোগিয়া': এখানেও শব্দটার অর্থ হলো, 'ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব'।

(ছ) মথি ৫:১৮ দ্রঃ।

(জ) সাম ১১৯:৮৫ দ্রঃ, গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

৩ (ক) 'ক্ষুদ্র শব্দগুলো', অর্থাৎ উপাসনায় ব্যবহৃত গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদগুলোতে উচ্চরিত ক্ষুদ্র শব্দ যেমন 'দ্বারা', 'সঙ্গে', 'মধ্য' ইত্যাদি শব্দগুলো।

৪ (ক) ১ করি ৮:৬ দ্রঃ।

(খ) ভ্রান্তমতপন্থীরা কেবলমাত্র পিতা-ঈশ্বরকেই 'নির্মাতা' বলে মানত; সাধু বাসিল পুত্র-ঈশ্বরকেও একই নির্মাতা-ভূমিকা আরোপ করেন।

৬ (ক) ১ করি ৮:৬।

(খ) ১ করি ১১:১২।

(গ) আদি ৬:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) যাত্রা ২৫:৩১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) ১ করি ১৫:৪৭।

(চ) যোব ৩৩:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ছ) ১ করি ১:৩০।

(জ) ১ করি ১১:১২।

৭ (ক) ১ করি ৮:৬ দ্রঃ।

(খ) 'হিপোস্তাসিস' শব্দের প্রকৃত অর্থের জন্য ভূমিকা-শব্দার্থ দ্রঃ। কিন্তু এই বাক্যে 'হিপোস্তাসিস' শব্দের অর্থ হলো **'ব্যক্তি'**। সুতরাং, বাস্তব অর্থ অনুসারে বাক্যটা এরূপ: 'এ এমন কথা নয় যা নিয়ম দানকারী ব্যক্তির উচ্চারিত কথা, কিন্তু এমন ব্যক্তিরই কথা যিনি **ব্যক্তিত্রয়ের** মধ্যে স্পষ্টভাবেই প্রভেদ রাখেন

(গ) রো ১১:৩৬।

(ঘ) রো ১১:৩৪।

(ঙ) ইশা ৪০:১২-১৩।

(চ) সাম ৯৪:১৬; ৩৪:১৩; ২৪:৩।

(ছ) ইশা ৪০:১৩।

(জ) যোহন ৫:২০ দ্রঃ।

(ঝ) সাম ১০৪:২৭; ১৪৫:১৬।

৯ (ক) এফে ৪:১৫-১৬।

(খ) কল ২:১৯।

(গ) এফে ১:২২।

(ঘ) যোহন ১:১৬।

(ঙ) যোহন ১৬:১৪।

(চ) লুক ৮:৪৬।

(ছ) গা ৬:৮।

(জ) ১ যোহন ৩:২৪।

(ঝ) মথি ১:২০।

(ঞ) যোহন ৩:৬।

১০ (ক) ১ করি ১:৯।

(খ) ২ করি ১:১।

(গ) গা ৪:৭।

(ঘ) রো ৬:৪।

(ঙ) ইশা ১৯:১৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(চ) ১ করি ২:১০।

(ছ) ২ তি ১:১৪।

(জ) ১ করি ১২:৮।

১১ (ক) সাম ১০৮:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সাম ৭১:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(গ) সাম ৮৯:১৭।

(ঘ) এফে ৩:৯।

(ঙ) ১ থে ১:১।

(চ) রো ১:১০।

(ছ) রো ২:১৭।

১২ (ক) 'থেওলোগিয়া' : এখানেও শব্দটার অর্থ হলো, 'ঈশ্বর-রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব'।

(খ) 'আদম যখন ঘোষণা করেন, আমি ঈশ্বর দ্বারা একটা মানুষকে কিনেছি' ইত্যাদি: সাধু বাসিল এখানে ভুল করেন, কেননা আদি ৪:১ অনুসারে আদম নয়, হবাই সেই কথা উচ্চারণ করেন।

(গ) গণনা ৩৬:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) আদি ৪০:৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) গা ৪:৪।

(চ) ১ করি ১১:১২।

(ছ) রো ৯:২১ দ্রঃ।

১৩ (ক) মথি ৫:১১।

(খ) যারা এ ভ্রান্তমত সমর্থন করত, তারা ছিল এউসেবিউসের পন্থীরা।

(গ) পবিত্র আত্মা সম্পর্কে ব্যবহৃত "সহঅনুক্রমিত", "উপঅনুক্রমিত", "সহগণিত", "উপগণিত" ইত্যাদি শব্দগুলোর জন্য ভূমিকা-শব্দার্থ দ্রষ্টব্য।

১৪ (ক) যোহন ১:১।

১৫ (ক) সাম ১৩৯:৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সাম ১১০:১; হিব্রু ১:৩।

(গ) ১ করি ১:২৪।

(ঘ) কল ১:১৫।

(ঙ) হিব্রু ১:৩।

(চ) যোহন ১৪:৯।

(ছ) মার্ক ৮:৩৮।

(জ) যোহন ৫:২৩।

(ঝ) যোহন ৫:২৩; ১:১৪; ১:১৮।

(ঞ) 'পিতার বুক এমন আসন যা পুত্রের যোগ্য', (সাম ১১০:১ দ্রঃ) : সাধু বাসিলের এ কথায় 'পান্তোক্রাতোর' তথা বিশ্বনিয়ন্তা খ্রিষ্ট সংক্রান্ত সেই ধারণার আভাস পাওয়া যেতে পারে যা প্রাচীনকালীন সেই ছবিগুলো চিহ্নিত করত যেখানে খ্রিষ্টের সিংহাসন পিতা ঈশ্বরের বুকে স্থিত। তেমন ছবিগুলো পিতা ঈশ্বরের আকৃতিও বহন করত বিধায় পরবর্তীকালে মন্ডলী দ্বারা অস্বীকৃত হলো যেহেতু পিতা ও পবিত্র আত্মার মানব রূপ না থাকায় তাঁদের ছবি আঁকা বা উপাসনার লক্ষ্যে ব্যবহার করা বিধেয় নয়। সুতরাং এ ছবি অস্বীকৃত হলেও তবু এখানে তা শুধু এই লক্ষ্যেই প্রদর্শিত যাতে প্রাচীন ধারণার একটা প্রমাণ দেওয়া হয়।

(ট) যোহন ৫:২৩।

(ঠ) প্রেরিত ৭:৫৫।

(ড) রো ৮:৩৪।

(ঢ) সাম ১১০:১।

(ণ) হিব্রু ৮:১।

(ত) বারুক ৩:৩।

১৬ (ক) সাধু বাসিল নিজেই বলেন, তাঁর ব্যবহৃত গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ বিধেয়, কেননা স্তুতিবাদটা মণ্ডলীর পরম্পরা দ্বারা স্বীকৃত ও পবিত্র শাস্ত্রের মন অনুযায়ী স্তুতিবাদ।

১৭ (ক) রো ১:৮।

(খ) রো ১:৫ দ্রঃ।

(গ) রো ৫:২।

(ঘ) ফিলি ২:৯।

(ঙ) যোহন ৫:২০।

(চ) যোহন ১:১৮।

(ছ) ১ করি ১:২৪।

(জ) যোহন ১:১।

(ঝ) যোহন ১০:৭-৯।

(ঞ) যোহন ১৮:২৭।

(ট) মথি ৯:১২।

(ঠ) মথি ৯:১৫।

(ড) যোহন ১৪:৬।

(ঢ) যোহন ১০:৭-৯।

(ণ) যোহন ৪:১৪।

(ত) যোহন ৬:৪৮।

(থ) মথি ৩:১০।

(দ) ১ করি ১০:৪।

(ধ) যোহন ১০:২৭।

(ন) যোহন ১০:৯।

(প) ফিলি ২:১০-১১।

১৮ (ক) এফে ৫:২৭ দ্রঃ।

(খ) রো ৮:৩৭।

(গ) মথি ১২:২৯ দ্রঃ।

(ঘ) ২ তি ২:২১ দ্রঃ।

(ঙ) যোহন ১৪:৬ দ্রঃ।

(চ) যোহন ১৪:৬।

১৯ (ক) যোহন ১:৯।

(খ) ২ তি ৪:৮।

(গ) যোহন ৫:২২।

(ঘ) হিব্রু ১:৩।

(ঙ) যুদিথ ৯:৫-৬।

(চ) যোহন ৬:৫৭।

(ছ) যোহন ৫:১৯।

(জ) যোহন ১২:৪৯।

(ঝ) যোহন ৫:১৯ দ্রঃ।

(ঞ) হিব্রু ২:১০।

(ট) যোহন ১৭:১০।

(ঠ) ১ করি ১:২৪।

(ড) যোহন ১:৩।

(ঢ) কল ১:১৬।

২০ (ক) যোহন ১২:৪৯-৫০; ১৪:২৪; ১৪:৩১।

(খ) যোহন ৫:২০।

(গ) কল ২:৩।

২১ (ক) যোহন ১৪:৯ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ২:৮ এবং রো ৮:৩২।

(গ) গা ৩:১৩।

(ঘ) রো ৫:৮।

(ঙ) মথি ৮:৩।

(চ) মার্ক ৪:৩৯।

(ছ) মথি ৫:২২।

(জ) মার্ক ৯:২৫।

২২ (ক) আদি ১:২.

(খ) যোহন ১৫:২৬.

(গ) সাম ৫১:১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) সাম ৫১:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) যোহন ৪:২৪।

(চ) প্রজ্ঞা ১:৭ দ্রঃ।

২৩ (ক) ১ তি ৬:২০। 'মিথ্যা জ্ঞান' বলতে এখানে ভ্রান্তমত বোঝায়।

২৪ (ক) প্রেরিত ৫:২৯।

(খ) মথি ২৮:১৯।

২৬ (ক) রো ৬:১৭ দ্রঃ।

(খ) 'প্রস্থান' অর্থাৎ মৃত্যু। তাই মৃত্যু পৃথিবী থেকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৃহ অভিমুখে প্রস্থান বলে উপস্থাপিত।

(গ) 'পরম্পরাগত একটা উপাদানের অভাবী বাপ্তিস্ম': উপাদানটা হলো বাপ্তিস্ম-সূত্রে ব্যক্ত বিশ্বাস। সুতরাং, বাপ্তিস্ম যেন অভাবী অর্থাৎ অকৃতকার্য না হয়, সেজন্য বাপ্তিস্ম-সূত্রে ব্যক্ত বিশ্বাস-ই দরকারী উপাদান।

(ঘ) ‘যে বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি আমরা [মণ্ডলীতে] আমাদের প্রথম প্রবেশে তখনই গচ্ছিত রেখেছিলাম’ ইত্যাদি: এতে অনুমান করা যায়, বাপ্তিস্ম পাবার জন্য সেকালে লিখিত বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি দরকার ছিল (১ পি ৩:২১ দ্রঃ)।

(ঙ) এফে ২:১২ দ্রঃ।

(চ) কল ২:৪ দ্রঃ।

(ছ) (১) পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা নামত্রয়ের বাপ্তিস্ম-মিনতি, (২) বিশ্বাস-স্বীকৃতি ও (৩) গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ: সাধু বাসিলের মতে এ তিনটে বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত, ও একই ঐশরহস্য প্রকাশ করে।

(জ) ‘পিতা ও পুত্র থেকে অবিচ্ছিন্ন [পবিত্র] আত্মাকে রক্ষা ও পালন করা’: বিষয়টা ১৬ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে।

২৭ (ক) প্রবচন ২৩:২৯ দ্রঃ।

(খ) বাপ্তিস্ম দানকালে বিশ্বাস-স্বীকৃতি সূত্রটা যে পরম্পরাগত, তা স্পষ্ট; এই সংক্ষিপ্ত আদি-সূত্র থেকেই বিস্তারিত বিশ্বাস-সূত্রের উৎপত্তি হয়।

(গ) ‘পবিত্র আত্মার শত্রুরা’: এখানে সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের কথা বলা হচ্ছে যারা পবিত্র আত্মার বিরোধী ছিল বিধায় Πνευματομάχοι (প্নেউমাতোমাখোই) বলে চরিচিত ছিল।

(ঘ) ১ করি ১২:৩।

(ঙ) যোহন ১:১৮।

(চ) রো ৮:১৫ দ্রঃ।

২৮ (ক) গা ৩:২৭।

(খ) রো ৬:৩ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ১০:৩৮।

(ঘ) ইশা ৬১:১।

(ঙ) সাম ৪৫:৮।

(চ) ১ করি ১২:১৩ দ্রঃ।

(ছ) প্রেরিত ১:৫।

(জ) লুক ৩:১৬।

(ঝ) সাম ১০৩:৪ দ্রঃ।

২৯ (ক) ১ তি ৫:২১।

(খ) ২ তি ২:২।

(গ) লুক ১২:৮-৯।

(ঘ) ২ থে ১:৭।

৩০ (ক) সাম ৫০:৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৪:২৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৩২:১।

(ঘ) ইশা ১:২।

(ঙ) যেরে ২:১২-১৩।

(চ) আদি ২৪:২৬-২৭।

(ছ) আদি ৩১:৪৭।

(জ) যোশুয়া ২৪:২৭; বচনটা হিব্রু ও গ্রীক সত্তরী পাঠ্য থেকে ভিন্ন।

৩১ (ক) ১ করি ১০:২ দ্রঃ।

(খ) যাত্রা ১৪:৩১।

(গ) ১ করি ১০:৪।

(ঘ) যোহন ৭:৩৭।

(ঙ) যোহন ৬:৫১।

(চ) গণনা ২১:৬-৯; যোহন ৩:১৪ দ্রঃ।

(ছ) গণনা ২:৮।

(জ) ১ করি ১৫:২২; রো ৫:১৪ ··· ; ১৩:৮, ১০।

(ঝ) যাত্রা ১২:২৩।

(ঞ) ১ করি ১৫:২২।

(ট) সাম ১০৭:৪৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঠ) এফে ২:৫ দ্রঃ।

৩২ (ক) আদি ২২:১-১৪ দ্রঃ।

(খ) যোহন ২:১; মথি ১২:৪০।

(গ) রো ৬:৮ দ্রঃ।

(ঘ) ১ করি ১৫:৪৯ দ্রঃ।

(ঙ) ২ করি ৪:১০ দ্রঃ।

(চ) কল ৩:৯-১০ দ্রঃ।

৩৩ (ক) যাত্রা ১৪:৩১।

(খ) গা ৩:১৯।

(গ) যাত্রা ২০:১৯।

(ঘ) যোহন ৫:৪৬।

(ঙ) লুক ১৬:২৯।

(চ) ১ করি ১০:২।

(ছ) হিব্রু ৩:৬ দ্রঃ।

(জ) রো ১১:৩৩ দ্রঃ।

(ঝ) হিব্রু ১০:১।

(ঞ) ১ করি ২:৭ দ্রঃ।

৩৫ (ক) গা ৪:৫ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ৩:১০-১১।

(গ) যোহন ৩:৩।

(ঘ) কল ২:১১-১২।

(ঙ) সাম ৫১:৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(চ) গণণা ৮:১৯ দ্রঃ।

(ছ) রো ৬:৩-১০।

(জ) রো ৬:৬; ৭:৫।

(ঝ) রো ৬:২২ দ্রঃ।

(ঞ) ‘পবিত্র আত্মা … আমাদের প্রাণকে … আদি জীবনে নবীকৃত করেন’: পবিত্র আত্মা মানুষকে ঈশ্বরের সেই সাদৃশ্য ফিরিয়ে দেন যা সৃষ্টিলগ্নে মানুষকে দান করা হয়েছিল ও যা মানুষ পাপে পতিত হওয়ার ফলে হারিয়ে ফেলেছিল।

(ট) ১ পি ৩:২১।

৩৬ (ক) ‘পরমদেশে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা’: বাপ্তিস্মের মাধ্যমে মানুষ পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে তার সেই আদি সাদৃশ্য-অবস্থা ফিরে পায় যা সে তখনই ভোগ করত যখন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ও পরমদেশে রাখা হয়েছিল।

(খ) মথি ৩:১১।

(গ) ১ করি ৩:১৩ দ্রঃ।

৩৭ (ক) ১ করি ১৪:২৪-২৫।

(খ) প্রেরিত ৫:৯, ৪ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ১২:৪-৬।

(ঘ) ১ করি ১২:১১।

৩৮ (ক) ‘হিপোস্তাসিস’: ভূমিকায় ‘হিপোস্তাসিস’ শব্দার্থ বিশেষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, ‘হিপোস্তাসিস’ ধারণাটা কোন রকমে লাতিন মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত ‘ব্যক্তি’ ধারণা বলে অনুধাবনযোগ্য।

(খ) ১ করি ১২:৬।

(গ) সাধু বাসিল ত্রিত্বের তিন ঐশব্যক্তির ভিন্ন কর্ম-পদ্ধতি ঘোষণা করতে করতে একক সৃষ্টি-উৎস রক্ষা করেন। অর্থাৎ: একেশ্বর সৃষ্টি করেন কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্মে তিন ব্যক্তি স্ব স্ব বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন।

(ঘ) সাম ৩৩:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য: ৪র্থ শতাব্দীর সকল গ্রীক পিতৃগণ বচনটা ত্রিত্ব-দৃষ্টিকোণ অনুসারে ব্যাখ্যা করেন: অর্থাৎ, স্রষ্টা প্রভু লোগোস-বাণী-খ্রিষ্টের দ্বারা আকাশমণ্ডল গড়লেন ও নিজের মুখের ফুৎকারে অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রভাবে সৃষ্টির সমস্ত পরাক্রম উপস্থিত করলেন।

(ঙ) যোহন ১:১ দ্রঃ।

(চ) যোহন ১৫:২৬।

(ছ) সাম ১০৪:৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(জ) লুক ২:১৪।

(ঝ) ১ করি ১২:৩।

(ঞ) দা ১০:১১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ট) ১ করি ২:১০।

(ঠ) মথি ১৮:১০।

(ড) ‘পবিত্র আত্মা ছাড়া তেমন দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়’: সুতরাং পবিত্র আত্মা স্বর্গদূতদের জীবন, কেননা তিনিই তাঁদের জাগিয়ে না তুললে তাঁরা স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখের দর্শন পেতে পারতেন না।

(ঢ) ইশা ৬:৩।

৩৯ (ক) তীত ২:১৩।

(খ) যোহন ১:৩৩ ও লুক ৩:২২ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ১০:৩৮।

(ঘ) মথি ৪:১।

(ঙ) মথি ১২:২৮।

(চ) ‘যা মানুষ ঈশ্বরের ফুৎকারের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল’, ইত্যাদি (আদি ২:৭ দ্রঃ): সেকালের ধারণাই যে, ঈশ্বর যে ফুৎকার দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রাণ ঢুকিয়েছিলেন, সেই ফুৎকারের সঙ্গে পবিত্র আত্মাকেও মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এধারণা তের্তুল্লিয়ানুসও সমর্থন করেন (বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ ৫:৭ দ্রঃ)।

(ছ) যোহন ২০:২৩।

(জ) ১ করি ১২:২৮ দ্রঃ।

(ঝ) ‘পবিত্র আত্মার দানগুলো’ খ্রিস্টের দেহ তথা মণ্ডলীর গঠনের লক্ষ্যে দান করা হয়। এখানে ও পরবর্তী বাক্যে মণ্ডলী এমন দেহের মত উপস্থাপিত যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য গুণে জীবন্ত ও কার্যকর; কিন্তু সেই ঐক্য এমন যা পবিত্র আত্মা দ্বারা সাধিত। পবিত্র আত্মায় সাধিত এই ঐক্য সম্পর্কে ও ভক্তদের মধ্যে পবিত্র আত্মার অবস্থান সম্পর্কে ২৬:৬১ দ্রঃ।

৪০ (ক) ১ তি ৬:১৫ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১৪:২ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ১৫:৪২।

(ঘ) এফে ৪:৩০ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ২৫:২১।

(চ) লুক ১৯:২৬ দ্রঃ।

(ছ) মথি ২৪:৫১ দ্রঃ।

(জ) লুক ১৯: ২৬ দ্রঃ।

(ঝ) ১ করি ২:১১ দ্রঃ।

৪৩ (ক) মথি ২৮:২৯ দ্রঃ।

৪৪ (ক) 'হিপোস্তাসিস': ভূমিকায় 'হিপোস্তাসিস' শব্দার্থ বিশেষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, 'হিপোস্তাসিস' ধারণাটা কোন রকমে লাতিন মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত 'ব্যক্তি' ধারণা বলে অনুধাবনযোগ্য।

(খ) 'মনার্খিয়া': অর্থাৎ 'ত্রিত্ব এক-ঈশ্বর' ধর্মতত্ত্ব।

(গ) হিব্রুরা 'ঈশ্বরের অনুচ্চারণীয় নাম বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা খোদাই করত': হিব্রুদের কাছে יהוה চার-অক্ষর বিশিষ্ট খোদাই করা এই শব্দই ঈশ্বরের অনুচ্চারণীয় নামের বদলে ব্যবহৃত হত। এবং নামটা উচ্চারণ করতে হলে তবে তারা אדני (আদোনাই, প্রভু) বলত; এ এমন প্রথা যা সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যেও রংরক্ষিত।

(ঘ) 'হিপোস্তাসিস': ভূমিকায় 'হিপোস্তাসিস' শব্দার্থ বিশেষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, 'হিপোস্তাসিস' ধারণাটা কোন রকমে লাতিন মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত 'ব্যক্তি' ধারণা বলে অনুধাবনযোগ্য।

৪৫ (ক) ইশা ৪৪:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য: 'আমি, ঈশ্বর, আমিই প্রথম ও আমিই শেষজন': অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও অনন্তকালীন।

(খ) 'ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরকে': নিকেয়া মহাসভার বিশ্বাস-সূত্র দ্রঃ।

(গ) 'হিপোস্তাসিস': ভূমিকায় 'হিপোস্তাসিস' শব্দার্থ বিশেষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, 'হিপোস্তাসিস' ধারণাটা কোন রকমে লাতিন মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত 'ব্যক্তি' ধারণা বলে অনুধাবনযোগ্য।

(ঘ) এখানে 'থেওলোগিয়ার' অর্থ হলো 'পবিত্র ত্রিত্ব-রহস্য'।

(ঙ) 'মনার্খিয়া': অর্থাৎ 'ত্রিত্ব এক-ঈশ্বর' ধর্মতত্ত্ব।

৪৬ (ক) রো ৮:৯।

(খ) যোহন ১৬:১৪।

(গ) ১ করি ১:২৪ দ্রঃ।

(ঘ) মালা ১:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) যোহন ১৭:৪।

(চ) যোহন ১৬:১৪।

(ছ) যোহন ১২:২৮।

(জ) মথি ১২:৩১।

৪৭ (ক) মথি ১১:২৭ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১২:৩।

(গ) যোহন ৪:২৪।

(ঘ) সাম ৩৬:১০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) যোহন ১:৯।

(চ) এ ধারণা ২৬:৬৪-তে বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়।

(ছ) তাই, বাপ্তিস্ম দানের সময়ে উচ্চারিত সূত্রের জোরে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির ὁμοτιμία (হমোতিমিয়া) অর্থাৎ সেই তিন ব্যক্তির দেয় 'সমসম্মান' রক্ষা করার সাথে সাথে সাধু বাসিল সেই পরম্পরাগত শিক্ষাও রক্ষা করেন যা অনুসারে মানুষ পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা পিতার কাছে যেতে পারে।

(জ) 'মনার্খিয়া': অর্থাৎ 'ত্রিত্ব এক-ঈশ্বর' ধর্মতত্ত্ব।

(ঝ) 'হিপোস্তাসিস': ভূমিকায় 'হিপোস্তাসিস' শব্দার্থ বিশেষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, 'হিপোস্তাসিস' ধারণাটা কোন রকমে লাতিন মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত 'ব্যক্তি' ধারণা বলে অনুধাবনযোগ্য।

(ঞ) এখানে 'থেওলোগিয়ার' অর্থ হলো 'পবিত্র ত্রিত্ব-রহস্য'।

(ট) 'প্রভুর জারীকৃত অনুক্রম': অনুক্রমটা হলো বাপ্তিস্ম দান কালে ব্যবহৃত সূত্রের অনুক্রম তথা 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা' (মথি ২৮:২৯ দ্রঃ)।

(ঠ) 'উপগণনা': নিজের বিশ্লেষণ-কর্ম শেষ ক'রে সাধু বাসিল এবার তাঁর বিরোধীদের সমর্থিত 'উপগণনা' ধারণার অযৌক্তিকতা দেখান।

(ড) ১ করি ১৫:৪৭ দ্রঃ।

(ঢ) ১ করি ১৫:৪৬ দ্রঃ।

৪৮ (ক) যোহন ৪:২৪।

(খ) বিলাপ ৪:২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(গ) মথি ১৯:১৭।

(ঘ) সাম ৫১:১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) সাম ৯২:১৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(চ) যোহন ১৪:১৬।

(ছ) ইশা ৬৩:১৪।

(জ) যোহন ১৪:১৭; ১৫:২৬।

(ঝ) ইশা ১১:২।

(ঞ) যোব ৩৩:৪।

(ট) যাত্রা ৩১:৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

৪৯ (ক) ১ করি ৬:১১ দ্রঃ.

(খ) গা ৪:৬।

(গ) সাম ১০৪:৩০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) ২ করি ৫:১৭।

(ঙ) প্রেরিত ১০:২০।

(চ) প্রেরিত ১৩:২।

(ছ) ইশা ৪৮:১৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(জ) ইশা ৬৩:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঝ) সাম ৭৭:২১।

(ঞ) সাম ৮০:১।

(ট) সাম ৭৮:৫৩।

(ঠ) যোহন ১৪:১৬; ১৬:১৩।

৫০ (ক) রো ৮:২৬-২৭।

(খ) রো ৮:৩৪।

(গ) এফে ৪:৩০।

(ঘ) প্রেরিত ৭:৫১।

(ঙ) ইশা ৬৩:১০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(চ) সাম ১০৬:৩২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ছ) যোহন ১৫:১৫।

(জ) ১ করি ২:১১ দ্রঃ।

৫১ (ক) আদি ২৭:২৯-৪০ দ্রঃ।

(খ) আদি ২৫:২৫-২৭।

(গ) মালা ১:৬ক।

(ঘ) মালা ১:৬খ।

(ঙ) সাম ১১৯:৯১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

৫২ (ক) ২ থে ৩:৫।

(খ) ১ থে ৩:১২-১৩।

(গ) ২ করি ৩:১৭; ১৮।

(ঘ) ২ করি ৩:১৪, ১৬, ১৭।

(ঙ) যাত্রা ৩৪:৩৪ দ্রঃ।

(চ) ২ করি ৩:১৮ দ্রঃ।

(ছ) ১ করি ৩:১৬।

৫৩ (ক) যোহন ১৭:২৭।

(খ) যোহন ১৪:১৯।

(গ) যোহন ১৪:১৭।

(ঘ) যোহন ১৫:৩।

(ঙ) যোহন ১৪:১৭।

(চ) ইশা ৪২:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

৫৪ (ক) প্রেরিত ৮:২৬ ও ১০:৩ দ্রঃ।

(খ) লুক ১:১১ … দ্রঃ।

(গ) দা ১৪:৩৩।

(ঘ) যেরে ২০:২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঙ) এজে ১:১ দ্রঃ।

(চ) প্রজ্ঞা ১:৭।

(ছ) সাম ১৩৯:৭।

(জ) হগয় ২:৪-৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(ঝ) পবিত্র আত্মা 'স্বরূপে ঐশ্বরিক': ভূমিকায়ও বলা হয়েছে যে, যদিও সাধু বাসিল প্রত্যক্ষভাবে কখনও এমনটা বলেন না যে 'পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর', তবু পবিত্র আত্মা যে 'স্বরূপে ঐশ্বরিক' তেমনটা বলায় তিনি নিজের প্রতিরোধীদের মন জয় করতে অভিপ্রায় করেন যাতে তারাও অবশেষে স্বীকার করে যে, পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর।

৫৫ (ক) সাম ৮:৬।

(খ) রো ২:১০।

(গ) রো ৯:৪ দ্রঃ।

(ঘ) সাম ৩০:১৩।

(ঙ) সাম ১০৮:২।

(চ) ১ করি ১৫:৪১ দ্রঃ।

(ছ) ২ করি ৩:৯।

(জ) ২ করি ৩:৮।

(ঝ) 'সেই পাপ ... যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়': পাপটা হলো পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে সেই পাপ যার ক্ষমা হয় না।

(ঞ) মথি ১০:১৯-২০; লুক ১২:১১-১২ দ্রঃ।

(ট) হিব্রু ৬:৪ দ্রঃ।

(ঠ) ২ করি ৩:১৭।

৫৬ (ক) রো ৮:১১।

(খ) যোহন ১০:২৭-২৮ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৬:৬৩।

(ঘ) রো ৮:১০।

(ঙ) যোহন ৬:৬৩।

৫৭ (ক) রো ৮:২ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ১:৮।

(গ) রো ৮:৩২।

(ঘ) 'মনুষ্যত্বধারণ': অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র যে মানুষ হলেন যা গ্রীক ভাষায় বলে, 'Ενανθρώπηση (এনান্ত্রপেসে)। প্রাচীনকালে এ শব্দের সঙ্গে 'Ενσάρκωση (এন্‌সার্কোসে) শব্দও প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ 'মাংস হওয়া' বা 'মাংসধারণ'। কিন্তু পরবর্তীকালে এ দ্বিতীয় শব্দটাই প্রাধান্য পায়, সম্ভবত এ কারণে যে, শব্দটা বাইবেল থেকে তথা 'বাণী হলেন মাংস' (যোহন ১:১৪) বচন থেকে উৎপন্ন।

(ঙ) ১ করি ২:১২।

(চ) গা ৪:৬।

৫৮ (ক) সাম ৬৬:১৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সাম ১০৫:৩৭।

(গ) সাম ৪৪:১০।

(ঘ) সুতরাং, যে গৌরবারোপণ-স্তুতিবাদ "সঙ্গে" ব্যবহার করে, ও যেটা "মধ্যে" ব্যবহার করে, দু'টোই মণ্ডলীর পরম্পরাতে গৃহীত ও সমান মর্যাদার অধিকারী।

৫৯ (ক) ২ করি ১৩:১৩।

(খ) রো ১৫:৩০।

(গ) 'হিপোস্তাসিস': ভূমিকায় 'হিপোস্তাসিস' শব্দার্থ বিশেষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, 'হিপোস্তাসিস' ধারণাটা কোন রকমে লাতিন মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত 'ব্যক্তি' ধারণা বলে অনুধাবনযোগ্য।

(ঘ) যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ।

(ঙ) যোহন ১০:৩০।

৬১ (ক) রো ৮:২৩-১৪, ২৯ দ্রঃ।

(খ) এফে ১:১৭-১৮ দ্রঃ।

(গ) গণনা ১১:২৫-২৬ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ১০:২০।

(ঙ) রো ১২:৫-৬।

(চ) ১ করি ১২:২১।

(ছ) ১ করি ১২:২৬।

৬২ (ক) সাম ৩১:৩।

(খ) যাত্রা ৩৩:২১।

(গ) দ্বিঃবিঃ ১২:১৩-১৪।

(ঘ) যোহন ৪:২৩।

(ঙ) আদি ২৮:১৬।

(চ) ২ করি ২:১৭।

(ছ) ২ করি ১৩:৩।

(জ) ১ করি ১৪:২।

৬৩ (ক) ১ করি ৭:৪০।

(খ) ১ তি ১:১৪।

৬৪ (ক) যোহন ৪:২৩-২৬ দ্রঃ।

(খ) হিব্রু ১:৩ দ্রঃ, 'এই পুত্র [হলেন]… তাঁর মূল-সত্তার সূক্ষ্ম ছাপ স্বরূপ'; এ পদ এমন যা সাধু আথানাসিউসও ব্যাখ্যা করেছিলেন।

৬৫ (ক) 'আমরা আগে বলেছি': ৫:১১ দ্রঃ।

(খ) 'যথেষ্টই বলেছি': ২৬:৬১ দ্রঃ।

৬৬ (ক) 'যখন এউখারিস্তিয়ার রুটি ও স্তুতিবাদের পানপাত্র [প্রভুর দেহ ও রক্তকে] দেখায়, সেসময় (ইত্যাদি)': বাক্যটা রুটি ও আঙুররসের পবিত্রীকরণকে নির্দেশ করে।

(খ) আদি ২:৮ দ্রঃ।

(গ) দিনটা হলো রবিবার যা প্রভুর পুনরুত্থানের স্মারক দিবস।

(ঘ) কল ৩:১ দ্রঃ।

(ঙ) আদি ১:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(চ) প্রকাশ ১৭:১১ দ্রঃ।

(ছ) ৬ ও ১২ নং সামসঙ্গীতের শিরনামে লেখা রয়েছে, 'অষ্টমে' (বা 'অষ্টতন্ত্রী বাদ্যযন্ত্রে')।

৬৮ (ক) ১ করি ৬:১১।

(খ) ১ করি ৫:৪।

৬৯ (ক) কল ২:১৩।

(খ) ২ করি ৫:৮ দ্রঃ।

(গ) ফিলি ১:২৩।

(ঘ) ১ করি ৩:৯; ২ করি ৬:১।

(ঙ) কল ৩:৩-৪ দ্রঃ।

(চ) রো ৮:১৭ দ্রঃ।

(ছ) রো ৮:১৭।

(জ) রো ৮:১৬।

(ঝ) ফিলি ৩:২১; ১ করি ১৫:৪৪ দ্রঃ।

(ঞ) তীত ১:২।

(ট) ১ থে ৪:১৭ দ্রঃ।

৭০ (ক) রো ৮:১৭ দ্রঃ।

(খ) লুক ১৯৮:৮ দ্রঃ।

(গ) রো ৮:২৬ দ্রঃ।

(ঘ) ফিলি ৪:৭ দ্রঃ।

(ঙ) 'প্রজ্ঞা পুস্তক': অর্থাৎ সেই বেন-সিরা পুস্তক যার শেষ পদ বলে, 'সিরার ছেলে যিশুর প্রজ্ঞা'।

(চ) সিরা ৪৩:৩০।

৭১ (ক) ১ করি ১১:২।

(খ) ২ থে ২:১৫।

(গ) দ্বিঃবিঃ ১৯:১৫।

(ঘ) যোব ৮:৯।

(ঙ) 'এমন মানুষ': সাধু বাসিল কায়েসারিয়ার বিশপ দিয়ানিউসের কথা বলছেন।

৭২ (ক) ‘হিপোস্তাসিস’: ভূমিকায় ‘হিপোস্তাসিস’ শব্দার্থ বিশেষ দ্রঃ। স্বল্প কথায়, ‘হিপোস্তাসিস’ ধারণাটা কোন রকমে লাতিন মণ্ডলীগুলোতে প্রচলিত ‘ব্যক্তি’ ধারণা বলে অনুধাবনযোগ্য।

(খ) ‘পালেস্তিনা’: সেই কালে, রোম-সাম্রাজ্যে গালিলেয়া, সামারিয়া ও নেগেব-মরুপ্রান্তর সহ যুদেয়া অঞ্চলগুলো ‘যটফর্থ্রধভট’ (পালেস্তিনা) বলে অভিহিত ছিল; পালেস্তিনার রাজধানী ছিল সামুদ্রিক কায়েসারিয়া; পালেস্তিনার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলটা পুরাতন নিয়মকালে ‘ফিলিস্তিয়া’ বলে অভিহিত ছিল (সাম ৬০:১০; ইশা ১৪:২৯; ইত্যাদি দ্রঃ)।

৭৩ (ক) ‘আমরা পিতা ও পুত্র ও ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার প্রশংসা করি’: এটা হলো ২য় বা ৩য় শতাব্দীতে রচিত Φῶς Ἱλαρόν (ফোস্ হিলারোন) সঙ্গীতের একটা অংশ। সঙ্গীতটা সান্ধ্যকালীন উপাসনায় বাতি জ্বালানোর সময়ে গান করা হত, ও এখনও খ্রিষ্টমণ্ডলীতে প্রচলিত। পুরা সঙ্গীত (যা সাধু বেনেডিক্ট মঠের প্রাহরিক উপাসনায় গান করা হয়) এরূপ:

আনন্দের জ্যোতি, অমর স্বর্গীয় পিতার
পবিত্র গৌরবের আনন্দের জ্যোতি।
যিশু জ্যোতি, ধন্য হে,
জ্যোতি যিশু, ধন্য হে, আনন্দের জ্যোতি।

সূর্য অস্ত গমন করল,
এসো, সান্ধ্য দীপ জ্বালিয়ে
সবে মিলে করি পূজা।
আনন্দের জ্যোতি …

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা
ঈশ্বরের করি স্তবগান,
চিরকালীন ঈশ্বর হে।
আনন্দের জ্যোতি …

ঈশ্বরপুত্র, জীবনদাতা,
বিশ্বপতি, পরিত্রাতা,
সবে বলে, ধন্য হে।
আনন্দের জ্যোতি …

৭৪ (ক) আরোগ্যদাতা বলে পরিচিত ‘মহান গ্রেগরি’ (জন্ম ২১৩, মৃত্যু ২৭০): তিনি ছিলেন নেওকায়েসারিয়ার বিশপ ও সাধু বাসিলের সমস্ত পরিবারের ভক্তির পাত্র।

(খ) কায়েসারিয়ার বিশপ ‘ফির্মিলিয়ানুস’ ২৬৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

(গ) পন্তসের বিশপ ‘মেলেতিউস’ এউসেবিউস-লিখিত ‘মণ্ডলীর ইতিহাসে’ উল্লিখিত।

(ঘ) আদি ১১:১-৯ দ্রঃ।

৭৫ (ক) হিব্রু ১০:৩৫-৩৬ দ্রঃ।

(খ) দা ৩:১৯ দ্রঃ।

(গ) উপ ৩:৭।

৭৭ (ক) ইশা ১০:৩; দ্বিঃবিঃ ১৯:১৪ দ্রঃ।

(খ) 'কেউ কেউ ইহুদীধর্মের প্রবাহ দ্বারা তিন 'প্রসোপোন' (πρόσωπον) একীভূত করতে আকর্ষিত' : অর্থাৎ, তারা যারা তিন ব্যক্তিকে একমাত্র ব্যক্তিতে পরিণত করে।

৭৮ (ক) উপ ৯:১৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(খ) আমোস ৫:১৪।

(গ) যাত্রা ২৩:৫ দ্রঃ।

৭৯ (ক) ১ করি ১৩:৫ দ্রঃ।

(খ) দা ৩:১২ … দ্রঃ।

(গ) মথি ৭:৬ দ্রঃ।